দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৮ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫।। ২০ ভাদ্র - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

আত্ম-নিবেদনের শতবর্ষে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)

১৮৭৯-১৯১৫

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ১ সংখ্যা, ২০ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৭ সেপ্টেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

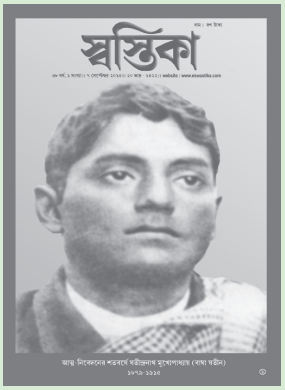

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ লাগামছাড়া অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ এবং অধিক সন্তানের জন্ম ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : রাজ্য বিধানসভার 'দাইমা' সোনালি দেবী ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

কয়াভূমিপুত্র যতীন্দ্রনাথ ▯ চন্দ্রমৌলী উপাধ্যায় ▯ ১২

তিনি মরলেন, দেশ জাগলো? ▯ অভিরূপ নাগচৌধুরী ▯ ১৬

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ ও স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী ▯ স্বামী প্রেমানন্দ গিরি ▯ ১৯

যতীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ▯ ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত ▯ ২১

ইতিহাসপুরুষ কৃষ্ণ : ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে ▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ২৭

না না, বিহারের নির্বাচন কখনোই প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওপর গণভোট নয় ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৩০

নাগা শান্তিচুক্তি কি ভারতের ঈশান কোণে নতুন ভোরের সঙ্কেত? ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ৩৫

এক তপোব্রতী শিক্ষক ▯ ড. তিলকরঞ্জন বেরা ▯ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ৩২-৩৩ ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৪০-৪১**

৬৮ বর্ষ পদার্পণে স্বস্তিকা'র শুভেচ্ছা

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৮তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে স্বস্তিকা-র সকল পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, লেখক, স্বস্তিকার কার্যকর্তা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

— স্বস্তিকা পরিবার

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাজ্যে কল-কারখানার অব্যবহৃত জমি

হিন্দুস্থান মোটরস্ কারখানা প্রায় বন্ধ। কারখানার চৌহদ্দি পেরোতেই বিস্তীর্ণ জমি— ওপার দেখা যায় না। এটাও কারখানারই জমি। অব্যবহৃত। এটা শুধু একটা নমুনা। এরকমই হাজার হাজার বিঘে অব্যবহৃত কল-কারখানার জমি খালি পড়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বুক জুড়ে। যখন জমি নীতি নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক চলছে, তখন এইসব অব্যবহৃত জমির অপব্যবহার রুখতে কি করা যেতে পারে এবং এর সম্ভাবনাই বা কতটুকু— এবারের স্বস্তিকা-র এটাই বিশেষ বিষয়। লিখেছেন— অম্লানকুসুম ঘোষ। আর এরই পাশাপাশি থাকছে ভারত-পাক সম্পর্ক নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলি ও অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়-এর লেখা।

সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা।। সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

খাগড়াগড়ের পর কাটোয়া

খাগড়াগড়ের পর আবার কাটোয়ার গাঁফুলিয়ার বিস্ফোরণে রাজ্যে জঙ্গি সন্ত্রাসের ছবি সামনে আসিল। খাগড়াগড়ের মতো এই স্থানেও মৃতদেহ লোপাটের অভিযোগ উঠিয়াছে। যথারীতি তৃণমূল সরকারের পক্ষ হইতে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে জমি লইয়া দুই প্রতিবেশীর বিবাদের গল্প বাজারে চালাইতে তৃণমূল দল এবং পুলিশের পক্ষ হইতে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। খাগড়াগড় কাণ্ডে বোমা বাঁধিবার ঘটনা যেমন পূর্বে কাকপক্ষীতেও জানিতে পারে নাই, তেমনই ঘটিয়াছে গাঁফুলিয়ায়। উদ্ধার হইয়াছে পটাসিয়াম নাইট্রেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট-সহ বিপুল বিস্ফোরক দ্রব্য। প্রশ্ন হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে আজ সন্ত্রাসের ছায়া কেন? কাহারা ইহার জন্য দায়ী এবং কাহাদের মদতে এই সন্ত্রাসের আয়োজন চলিতেছে।

প্রত্যহ সীমান্ত পার হইয়া শত শত অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিতেছে, ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিতেছে জঙ্গিরাও। ইহার ফলে একদিকে যেমন বদলাইয়া যাইতেছে সীমান্ত এলাকার জনবিন্যাস তেমনই জঙ্গি অনুপ্রবেশের ফলে বিঘ্নিত হইতেছে রাজ্যের নিরাপত্তা। ভোটের কাঙাল রাজনৈতিক দলগুলি এইসব অনুপ্রবেশকারী এবং জঙ্গিদের সুযোগ সুবিধা দিয়া প্রশ্রয় দিতেছে। উল্লেখ্য, সারাদেশের তুলনায় এই রাজ্যেই কিন্তু মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচাইতে বেশি। সেনসাস ২০১১-য় দেখা যাইতেছে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরের চিত্র। মুর্শিদাবাদে হিন্দু জনসংখ্যা মাত্র ২৩ লক্ষ, অন্যদিকে মুসলমান ৪৭ লক্ষ। মালদহে হিন্দু ১৯ লক্ষ এবং মুসলমান ২০ লক্ষ আর উত্তর দিনাজপুরে হিন্দু ১৪ লক্ষ এবং মুসলমান ১৫ লক্ষ। রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও এই অগ্রগতি লক্ষণীয়। জেলাগুলির জনবিন্যাস এইভাবে বদলাইয়া যাইবার ফলে তাহার প্রভাব আরম্ভ হইয়াছে। বর্ধমান সীমান্তবর্তী জেলা নয়, এই জেলায় সম্পন্ন-হিন্দুরা বসবাস করিয়া থাকেন। বর্ধমানকে কব্জা করিতে হইলে তাই কৌশলের প্রয়োজন। খাগড়াগড় এবং কাটোয়ার দুইটি ঘটনাই কিন্তু বর্ধমানের। হিন্দুরা যাহাতে ভীত হইয়া এই জেলা ছাড়িতে বাধ্য হয় তাহার জন্যই এই প্রস্তুতি। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর বাংলাদেশে পরিণত করিয়া মুসলমান প্রধান অঞ্চলের রূপরেখা তৈরির প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়াছে। এই সকলই তাহারই লক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিকে ঠিক করিতে হইবে তাহারা কি আগামী দিনে মুসলমান সমাজে বিলীন হইয়া যাইতে প্রস্তুত না উদ্বাস্তু হইয়া অন্য প্রদেশে দিন কাটাইবেন। মনে রাখিতে হইবে দেশ স্বাধীন হইবার কালে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার ৯ শতাংশ যাহা আজ ১৫ শতাংশে রূপান্তরিত। সেদিন ২৪ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা লইয়া জিন্না ২৬ শতাংশ জমি ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কংগ্রেস ভারতভাগ রোধ করিতে পারে নাই, বরঞ্চ সেইদিন কংগ্রেস কমিউনিস্টরা মুসলমানদের সমর্থন করিয়াছিল। আজও পশ্চিমবঙ্গের জমি বিচ্ছিন্ন হইলে কংগ্রেস-তৃণমূল-কমিউনিস্টরা নিশ্চুপই থাকিবে। হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে তাহাকে নিজের বলেই বলীয়ান হইতে হইবে। আজ বীরভূমের হিন্দুপ্রধান গ্রামেও দুর্গাপুজোয় বাধা দেওয়া শুরু হইয়াছে। গত বছর দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করিয়া রামপুরহাটে গণ্ডগোল এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। মুর্শিদাবাদে গ্রামে গ্রামে শঙ্খধ্বনি প্রদীপ জ্বালানো বন্ধ হইয়াছে আর ধর্মনিরপেক্ষ দেশের নির্লজ্জ প্রশাসন এই কাজের প্রধান সহায়ক। তাই খাগড়াগড়ের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা রহিয়াই যাইতেছে।

সুভাষিতম্

শোকস্থানসহস্রানি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্।। —(চাণক্যনীতি)

সংসারে শোকের কয়েক সহস্র কারণ আছে, ভয়েরও কয়েক শত কারণ আছে। সেগুলি প্রতিদিন মূর্খদেরই আচ্ছন্ন করে, পণ্ডিতদের নয়।

ধর্মভিত্তিক জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশ

এই প্রথম হিন্দুদের সংখ্যা ৮০ শতাংশের কম, বাড়লো মুসলমান জনসংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৫ আগস্ট রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশনের ধর্মভিত্তিক রিপোর্ট (২০০১-২০১১) প্রকাশিত হয়েছে। ২০০১ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের জনসংখ্যা ছিল ৮২.৭৫ কোটি। ২০১১-তে তা বেড়ে ৯৬.৬৩ কোটি হলেও, শতাংশের বিচারে তা নিম্নাভিমুখী। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী ভারতে হিন্দুদের জনসংখ্যার হার ছিল ৮০.৪৫ শতাংশ। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৯.৮ শতাংশে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম হিন্দুদের সংখ্যা ৮০ শতাংশের নীচে নামল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে হিন্দুদের জনসংখ্যা হ্রাসের হার ০.৭ শতাংশ। অপরদিকে হিন্দু ছাড়া অন্যান্য মতাবলম্বীদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মুসলমান সম্প্রদায়।

গত দশ বছরে জনসংখ্যা বেশ কয়েক শতাংশ বাড়িয়ে নিয়েছে তারা। কমিশন প্রকাশিত তথ্যানুসারে বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা ১৭.২২ কোটি, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১৪.২ শতাংশ। প্রকাশিত এই জনগণনার রিপোর্ট অনুসারে দেশে খৃষ্টান রয়েছে ২.৭৮ কোটি (২.৩ শতাংশ), শিখ ২.০৮ কোটি (১.৭ শতাংশ), বৌদ্ধ ০.৮৪ কোটি (০.৭ শতাংশ), জৈন ০.৪৫ কোটি (০.৪ শতাংশ)। ধর্মীয় পরিচয় নেই এমন জনসংখ্যা ০.২৯ কোটি।

বিগত দশকগুলির মতোই আলোচ্য দশকেও জম্মু ও কাশ্মীর, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি মুসলমান বসবাস করে। ২০১১-র হিসেবে অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলমান। যা ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ছিল ২৫.২৫ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান বলছে, এই তিন রাজ্যে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার তাদের জাতীয় গড় বৃদ্ধির তুলনায় দ্বিগুণ। এই রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮২৫।

২০০১ থেকে ১১-র মধ্যে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি অসমে। ২০০১ সালে যেখানে অসমে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৩০.৯ শতাংশ, ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.২ শতাংশে। ব্যাপক অনুপ্রবেশই এই বৃদ্ধির কারণ বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত। এছাড়া যেসব রাজ্যে ১ শতাংশের বেশি মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলি হলো উত্তরাখণ্ড, কেরল, গোয়া, জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা এবং দিল্লী। মণিপুরই একমাত্র রাজ্য যেখানে মুসলমান জনসংখ্যার হার কমেছে ০.৪ শতাংশ।

জনগণনার এই রিপোর্টে ধর্মীয় জনবিন্যাসের যে চিত্রটা উঠে এসেছে তা হলো হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফারাক যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৬.৮ শতাংশের সঙ্গে ২৪ শতাংশের তুলনা চলে না। তাই সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের মতো রাজ্যগুলির জনসমীক্ষা করা দরকার।

জনগণনা : ভারতের ধর্মীয় জনবিন্যাসের চালচিত্র

সম্প্রদায়	মোট জনসংখ্যা (শতাংশে)		দশ বছরে বৃদ্ধি হার (শতাংশে)
	২০১১	২০০১	২০০১-২০১১
সমস্ত সম্প্রদায়	১০০	১০০	১৭.৭
হিন্দু	৭৯.৮	৮০.৫	১৬.৮
মুসলমান	১৪.২	১৩.৪	২৪.৬
খৃষ্টান	২.৩	২.৩	১৫.৫
শিখ	১.৭	১.৯	৮.৪
বৌদ্ধ	০.৭	০.৮	৬.১
জৈন	০.৪	০.৪	৫.৪
অন্যান্য	০.৯	০.৭	—

ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

রাজ্য	২০০১	২০১১	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার*
মহারাষ্ট্র	১,০২,৭০,৪৮৫	১,২৯,৭১,১৫২	২৬.৩ শতাংশ
গুজরাট	৪৫,৯২,৮৫৪	৫৮,৪৬,৭৬১	২৭.৩ শতাংশ
রাজস্থান	৪৭,৮৮,২২৭	৬২,১৫,৩৭৭	২৯.৮১ শতাংশ
মধ্যপ্রদেশ	৩৮,৪১,৪৪৯	৪৭,৭৪,৬৯৫	২৪.২৯ শতাংশ
উত্তরপ্রদেশ	৩,০৭,৪০,১৫৮	৩,৮৪,৮৩,৯৬৭	২৫.১৯ শতাংশ
বিহার	১,৩৭,২২,০৪৮	১,৭৫,৫৭,৮০৯	২৭.৯৫ শতাংশ
সারা ভারতে	১৩,৮১,৮৮,২৪০	১৭,২২,৪৫,১৫৮	২৪.৬৪ শতাংশ

*শতাংশের ভিত্তিতে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে সমস্ত রাজ্যে।

(সূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস)

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি

মুর্শিদাবাদে বৃদ্ধির হার কাশ্মীরের অনন্তনাগের থেকেও বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ধর্মভিত্তিক আদমশুমারি রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে উঠে এসেছে ভয়ানক তথ্য পরিসংখ্যান। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্তবর্তী পাঁচটি জেলায় অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে জনসংখ্যা যা গোটা দেশের গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরিখে কয়েক শতাংশ বেশি। উত্তর দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য রাজ্যের জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধির হার সেখানে ১৪ শতাংশের কিছু কম, সেখানে উপরোক্ত জেলাগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ বা তার বেশি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পাঁচটি জেলাতেই বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বেশি বলে বারংবার অভিযোগ উঠেছে। উত্তর দিনাজপুরে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশি (২২.৯০ শতাংশ)। উত্তর দিনাজপুরে ২০০১-এ যেখানে জনসংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৯৪ জন, সেখানে ২০১১-তে বেড়ে জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ ৮৪৯ জন হয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার এর ঠিক পাশের জেলা জলপাইগুড়িতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ১৩.৭৭ শতাংশ। মালদহ-তেও ঠিক এই একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। ২০০১-এর জনসংখ্যার পরিসংখ্যান ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৬৮ জন থেকে ২০১১-তে ২১.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৭০ জন-এ দাঁড়িয়েছে। মুর্শিদাবাদেও ২০০১-এ ৫৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৬৯ জনসংখ্যা থাকলেও ২০১১-তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১ লক্ষ ৩ হাজার ৮০৭ জন।

পশ্চিমবঙ্গ : ২০১১ জনগণনার হিসাব অনুযায়ী		
মোট জনসংখ্যা	—	৯.১ কোটি
হিন্দু	—	৬.৪ কোটি
মুসলমান	—	২.৪ কোটি

যা কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার (১০ লক্ষ ৭০ হাজার) থেকেও বেশি। অথচ এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির আঁচ কিন্তু পাশের জেলা বর্ধমানে পড়েনি। এই তালিকায় পরবর্তী স্থানে থাকা বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও ২০০১-২০১১-র মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৬.১৫ এবং ১৮.০৫ শতাংশ। এই পাঁচটি জেলায় জনসংখ্যা জাতীয় গড়ের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে গোয়েন্দাদের কপালেও। এটা স্বাভাবিক বৃদ্ধি নাকি অনুপ্রবেশের ফল, তা নিয়ে গভীর দ্বন্দ্বে রয়েছেন গোয়েন্দারা। কারণ বিগত তিন দশক ধরে ব্যাপক অনুপ্রবেশ এবং রাজনৈতিক আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে অনুপ্রবেশকারীদের রেশনকার্ড ও ভোটারকার্ড তৈরি হয়ে যাওয়ার অলিখিত প্রথা পশ্চিমবঙ্গে জনবিস্ফোরণের পিছনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। তবে বেশ কয়েক বছরে অনুপ্রবেশের সময় বি এস এফ ও পুলিশের হাতে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি ধরা পড়লেও অনুপ্রবেশের চোরাস্রোত যে খুব ভালোভাবেই পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছে, তা এই পরিসংখ্যানেই প্রমাণ। গোয়েন্দারা বলছে, তদন্ত করে দেখা হবে কোনো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সরকারি খাতায় নাম নথিভুক্ত করেছে কিনা।

এক নজরে জনগণনার কিছু তথ্য

- ভারতে বর্তমানে মোট জনসংখ্যা ১২১.০৯ কোটি। এর মধ্যে হিন্দু ৯৬.৬৩ কোটি, মুসলমান ১৭.২২ কোটি এবং খৃষ্টান ২.৭৮ কোটি, অন্যান্য ৪.৪৬ কোটি।
- ২০০১-এর তুলনায় ২০১১-তে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০০১ সালের জনগণনা সমীক্ষা অনুযায়ী হিন্দু জনসংখ্যা যেখানে ছিল ৮০.৫ শতাংশ, সেখানে ২০১১-তে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৯.৮ শতাংশে। অন্যদিকে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে। ছিল ১৩.৪ শতাংশ, হয়েছে ১৪.২ শতাংশ।
- মুসলমান জনসংখ্যা সবচেয়ে বেড়েছে অসমে। বিশেষত সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা একটা বড় সংখ্যায় রয়েছে।
- জাতীয় জনসংখ্যাগত দিক থেকে শিখদের সংখ্যা ১.৯ শতাংশ থেকে কমে ১.৭ শতাংশ হয়েছে। পাঞ্জাবে এই হারও ৫৯.৯ শতাংশ থেকে ৫৭.৭ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে হিন্দুদের হার বেড়েছে এখানে।
- জাতীয় জনসংখ্যায় খৃষ্টানদের হার আগের মতো ২.৩ শতাংশতেই রয়েছে।

(সূত্র : টাইমস অফ ইন্ডিয়া)

হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ শুরু করেছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে যেসব হিন্দুরা শরণার্থী হিসেবে এদেশে এসেছে, তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের লক্ষ্যে ভারত সরকার সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট (নাগরিকত্ব আইন) সংশোধনার্থে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে একটি অর্ডিন্যান্স আনতে চলেছে।

প্রাথমিকভাবে এটি অসম ও পশ্চিমবঙ্গে আগত বাংলাদেশি হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে। কীভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, চাকমা, খৃষ্টানদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে তাই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। সরকার মনে করছে যে বিষয়টি নিয়ে বিধানসভা ও সংসদ উত্তাল হবে। তবুও এর মাধ্যমে অসমে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হিন্দুদের কাছে একটা সদর্থক বার্তা যাবে। ২০১৬ বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে ওঠার আগেই শীতকালীন অধিবেশনে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে চায় কেন্দ্র সরকার। নাগরিকত্ব প্রদানের অঙ্গ হিসাবেই অসমে ন্যাশনাল রেজিস্ট্রি অফ সিটিজেনস্-এ নথিভুক্ত নাগরিকদের নাগরিকত্বের সত্যতা যাচাই-এর প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এর ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে অসমের উদ্বাস্তু হিন্দুরা। তাই অতি শীঘ্রই এদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। পরিচয়পত্রহীন বাঙালি হিন্দুদের পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার হওয়ার সময় কোনো পরিচয়পত্র তারা আনতে সক্ষম হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, বাংলাদেশ থেকে আগত যে সকল হিন্দুরা কোনো তথ্য দাখিল করতে পারছে না তাদের ফরেনারস অ্যাক্ট এবং পাসপোর্ট অ্যাক্ট অনুসারে শাস্তির আওতার বাইরে রাখা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অসম চুক্তি অনুসারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে ১৯৭১-এর মার্চের আগে আগত বাংলাদেশিদের নাগরিকত্ব দেওয়া হোত। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি বিচার করে এই ভিত্তিসীমা আরোও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে বর্তমান কেন্দ্র সরকার। ২০০৪ এর আগে যারা সীমান্ত পার হয়ে এসেছে তাদেরও যাতে নাগরিকত্ব দেওয়া যায়, তার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র সরকার।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

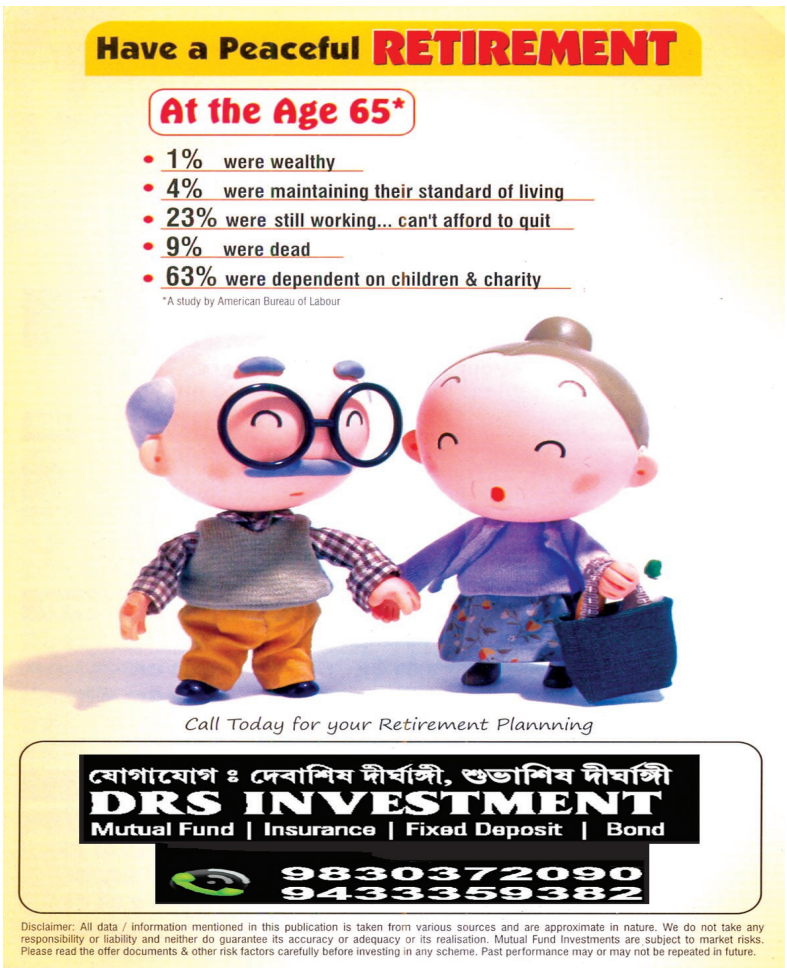

আম্বেদকর স্মরণে উদ্যোগী কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতীয় সংবিধানের স্থপতি ভীমরাও আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীকে স্মরণীয় করতে ১২৫ টাকা মূল্যের মুদ্রা চালু করার উদ্যোগ নিল বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবরে জানা গেছে, থাওয়ারচাঁদ গেহলটের নেতৃত্বে অর্থমন্ত্রক ও সামাজিক ন্যায় মন্ত্রালয় আম্বেদকরের নামাঙ্কিত মুদ্রার আকার এবং অর্থমূল্য নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার স্মারক ডাকটিকিটও প্রকাশ করবে বলে জানা গেছে। দিল্লীতে থাকাকালীন সময়ে ২৬, আলিপুর রোডের যে বাড়িতে আম্বেদকর থাকতেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেই বাড়িটি ভেঙে আম্বেদকর মেমোরিয়াল বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

পরিবারে পাঁচজন শিশু থাকলেই ২ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি শিবসেনার উত্তরপ্রদেশ শাখার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, যে হিন্দু পরিবারে ৫ জন শিশু থাকবে সেই পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এই খবরে উত্তরপ্রদেশ এমনকী সারা দেশেও এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। মূলত এর কারণ হিসাবে জানা যায়, সম্প্রতি জনগণনা সমীক্ষায় যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে মুসলমান জনসংখ্যার হার ক্রমবর্ধমান। অন্যদিকে হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী। আর তাতেই শিবসেনার পক্ষ থেকে এমন একটি ঘোষণা করা হয়। আগ্রার শিবসেনা সভাপতি বেনু লাভানিয়া বলেন, 'যে জনগণনার সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তাতে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে আর মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। শিব সেনার পক্ষ থেকে এই টাকা প্রদানের ঘোষণায় বিতর্কের ঝড় তুলেছে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার রাজনৈতিক দলগুলি।

গত দশ বছরে স্কুলমুখী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৮ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতে গত ১০ বছরে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩৮ শতাংশ, সম্প্রতি প্রকাশিত জনগণনার রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। ২০০১ থেকে ২০১১ এই এক দশকে ছাত্র সংখ্যা ২২৯ মিলিয়ন (২২ কোটি ৯০ লক্ষ) থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৫ মিলিয়নে (৩০ কোটি ১৫ লক্ষ)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ১৮ শতাংশ ছিল সেখানে স্কুলমুখী ছাত্রছাত্রীর বৃদ্ধির হার এক লাফে বেড়ে ৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এছাড়া তথ্যে আরও উঠে এসেছে যে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির হার ৬৪ শতাংশ। অর্থাৎ এই এক দশক ৪৪ মিলিয়ন (৪ কোটি ৪০ লক্ষ) থেকে বেড়ে তা হয়েছে ৭৬ মিলিয়ন (৭ কোটি ৬০ লক্ষ)। তবে এই যে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে তার বেশিরভাগই উচ্চশ্রেণীর ক্ষেত্রে। মূলত স্কুলগুলির উচ্চশ্রেণী এবং মাধ্যমিক স্তরে বেড়েছে এই সংখ্যা। এক্ষেত্রে অবশ্য মেয়েদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। উচ্চশ্রেণীর ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকলেও নিম্ন শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রে তা কিন্তু কম। অর্থাৎ কম বয়সী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম বলেই তা হচ্ছে। সমীক্ষায় জানা যায়, সাত বছরের শিশু স্কুলে আসার সংখ্যা কম। তার সংখ্যা প্রায় ৪.৮ মিলিয়ন। আবার ১৩ বছরের ক্ষেত্রে তা প্রায় ৭ শতাংশ নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে ১.৬ মিলিয়ন শিশু স্কুলেই যায় না বলে সমীভা তথ্যে জানা গেছে। এক্ষেত্রে দিল্লী আই আই টি-এর অধ্যাপক জায়ান জোস থমাস বলেন, বর্তমানে ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা ভীষণ ক্ষিদে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা এত ব্যাপকভাবে আগে কখনও দেখা যায়নি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষা একটা নিশ্চিত উপায় বলে গণ্য করা হচ্ছে।

তবে ওই এক দশকে ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলমুখী হওয়ার পিছনে জে জে থমাস দুটি কারণ লক্ষ্য করেছেন। তিনি মনে করেন, ৫ থেকে ৯ এবং ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ১৯৯৬ এবং ২০০৪-০৫-এ যে সর্বশিক্ষা অভিযানের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তা যেমন ফলপ্রসূ হয়েছে তেমনি মিড ডে মিলও তা করতে সাহায্য করেছে। তবে এন এস এস ও-এর তথ্যে দেখা গেছে ২০০৪-০৫-এর পর ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। এছাড়াও রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও তা ফুটে উঠেছে। ২০১১-এর সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী বলা যেতে পারে ১৫-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে কেরল সবচেয়ে বেশি এগিয়ে, সেখানে ৮৩ শতাংশ এবং ওড়িশাতে ৪৩ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৫৩ শতাংশ ও গুজরাটে ৫১ শতাংশ ছাত্র স্কুলগুলিতে যাচ্ছে। তবে মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ১৫ থেকে ১৯ বছরের ছাত্রছাত্রীদের আধিক্যই সবচেয়ে বেশি।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ লাগামছাড়া অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ এবং অধিক সন্তানের জন্ম

কেন্দ্রের মোদী সরকার সম্প্রতি ধর্মীয় ভিত্তিতে জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এর আগে ধর্মীয় ভিত্তিতে জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশে প্রবল আপত্তি করেছিল মনমোহন সিং সরকার। তবে একটা কথা শুরুতেই বলে রাখা ভাল যে সাম্প্রতিক প্রকাশিত রিপোর্টটি বেশ দুর্বোধ্য। এই রিপোর্টে সামগ্রিকভাবে সারাদেশে ধর্মীয় ভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা হিসাবটা পাওয়া গেলেও রাজ্যওয়ারি হিসাব বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা আশি শতাংশের কম। অন্যদিকে, মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ লাগামছাড়া অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ে অধিক সন্তানের জন্ম। গত ২০১১ সালের ওই জনগণনার রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে হিন্দু বিবাহিতা মহিলাদের ফার্টিলিটি রেট যেখানে মাত্র ২.২ শতাংশ সেখানে মুসলমান মহিলাদের জন্মদানের হার ৫.১ শতাংশ। এই কারণেই দেশে মুসলমান জনসংখ্যা এত দ্রুত বাড়ছে।

ধর্মীয়ভিত্তিক জনগণনার রিপোর্টটি যেহেতু ২০১১ সালের জনগণনার একটি অংশ তাই মূল রিপোর্টে কী বলা হয়েছিল দেখে নেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। বলা হয় যে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলমান। নিঃসন্দেহে এই সংখ্যা ২০১৫-তে ৩০ শতাংশ হয়েছে। ২০১১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ৬৬.২৭ শতাংশ। মালদহে ৫২ শতাংশ। অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরে ৫০ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩৬ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগনায় ২৬ শতাংশ। বীরভূম ৩৮ শতাংশ। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর সংসদীয় আসন থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হন। সেই জঙ্গিপুর আসনের ৭০ শতাংশ

গূঢ়পুরুষের কলম

ভোটদাতাই মুসলমান। এই মুসলমানরা মুর্শিদাবাদ জেলার ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করে। তাই রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারাই কমবেশি মুসলমান তোষণ করেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১২ শতাংশ। ওই সময় নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৩০ শতাংশ। এখন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার হার ৩০ শতাংশ এবং বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ৫ শতাংশেরও কম। কেন? অনুপ্রবেশ এবং নির্বিচারে জন্মদান। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের আমলেও হিন্দুদের উপর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। সেখানে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের এটিই প্রধান কারণ। বাঙালি সেকুলারবাদীরা বলবেন, মুসলমানদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধিতে উদ্বেগের কী আছে? অবশ্যই এটি উদ্বেগের বিষয়। বিশেষত খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর আই এস-তালিবান যোগ প্রমাণিত হওয়ার পর। অসম-বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-উত্তরপ্রদেশকে কেন্দ্র করে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের (মোগল-ই-স্তান) স্বপ্ন দেখছে জেহাদি জঙ্গিরা। সাম্প্রতিক ধর্মভিত্তিক জনগণনার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং উত্তরপ্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিহারে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৮ শতাংশ সেখানে হিন্দুর জন্মহার বেড়েছে ২৪ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের বাড়বাড়ন্তের প্রধান কারণ মমতা সরকারের তোষণ নীতি। সম্প্রতি ইমামদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী পুরো 'কলিমা শাহাদাত' মুখস্থ বলে প্রমাণ করতে চান যে তিনি মনেপ্রাণে একজন মুসলমানপ্রেমী। ইসলামে তাঁর অবিচল আস্থা। তাঁর আমলে ক্যানিং এলাকায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। কলকাতার কাছেই উস্তি বাজারে প্রায় ৫০টি হিন্দুর দোকান পুড়িয়ে দেয় দাঙ্গাবাজরা। কলকাতার মিডিয়া উস্তির ঘটনা চেপে যায়। ক্যানিং-য়ের দাঙ্গার অন্যতম প্রধান উস্কানিদাতা ও বেআইনি জঙ্গি ছাত্র-সংগঠন 'সিমি'র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হাসান ইমরানকে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ করেছেন মমতা। এবং সেটা করেছেন কেন্দ্র এবং রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা আই বি-র রিপোর্ট অগ্রাহ্য করে। মমতার রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গ এখন জঙ্গিদের অভয়াঞ্চল।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

রাজ্য বিধানসভার 'দাইমা' সোনালি দেবী

মাননীয় সোনালি গুহ
ডেপুটি স্পিকার
পশ্চিমবঙ্গ, বিধানসভা

প্রোটোকল আবার কী! ওসব পুঁথিতে থাকে। আসল জিনিসটা হচ্ছে ময়দানি রাজনীতি। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। সিপিএম গালাগাল দিত অতএব তাদেরও দিতে হবে। কিন্তু গোলটা অন্য জায়গায়। সবাই বলছে ডেপুটি স্পিকার হচ্ছেন সাংবিধানিক পদ। তাই অমন কথা বলা ঠিক হয়নি। একদম কান দেবেন না ওদের কথায়। আরে বাবা আপনি আগে রাজনীতিক, আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ ছাত্রী, তারপর বিধায়ক, তারপর ডেপুটি স্পিকার। কী এমন ব্যাপার। কোনো মানে হয়! বাকি সময়টা কি চুপ করে থাকা যায়! পেটের ভেতর গুড়গুড় করে না?

আপনার বক্তব্য, আচরণই তো বারবার খবরের শিরোনামে এনেছে! ডেপুটি স্পিকার একবারও খবরের কাগজে, টিভি চ্যানেলে জায়গা করে দেয়নি। তৃণমূলের অন্দরের ব্যাখ্যা, মুখে লাগাম পরানোর জন্যই দিদি আপনার মতো প্রিয়পাত্রীকে ডেপুটি স্পিকার পদ উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু সে লাগামে বাঁধা পড়েননি আপনি সোনালি গুহ। ডেপুটি স্পিকারের মতো সাংবিধানিক পদে থেকেই শাসক দলের রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনি এবার অবাক আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্রকে!

কলকাতা ময়দানে গাঁধী মূর্তির পাদদেশে শুক্রবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় হাজির ছিলেন আপনি সোনালি দেবী। সেখানে কী এমন বলেছেন যে এত বিতর্ক হবে! বিরোধী

দলনেতার সম্পর্কে বলেছেন, ''সূর্যবাবু মাঝে মাঝেই পেটে হাত দেন। যেন পেটে ন' মাসের বাচ্চা আছে। এমনভাবে পেটে হাত দেন, যা দেখে মনে হয় কোনো ভাবে পা পিছলে পড়ে গেলে বাচ্চার ক্ষতি না হয়!'' এর পরেই আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ করে বিরোধী দলনেতাকে আপনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ''বিধানসভায় আবার যদি সূর্যবাবু পেটে হাত দিয়ে কথা বলেন, তা হলে ন' মাসের বাচ্চাটাকে পেট ফাঁসিয়ে বের করে দেব!''

সবাই নিন্দা করেছে। আমি করছি না। আরে বাবা আপনি যেটা জানেন সেটাই তো বলবেন নাকি! আমার তো মনে হয়েছে ডেপুটি স্পিকার না হয়ে ভালো দাইমা হতে পারতেন!

সবাই বলছে প্রথমত, ডেপুটি স্পিকারের মতো সাংবিধানিক পদে থেকে রাজনৈতিক সভায় যাওয়া উচিত কি না, প্রশ্ন আছে তা নিয়েই। কিন্তু সোনালি দেবী আপনি তো অতীতের মতোই এবারও দলীয় সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে যেভাবে বিরোধী দলনেতাকে আক্রমণ করেছেন, তাতে নাকি স্তম্ভিত সব মহল!

এসব অবশ্য আপনার গা সওয়া। বিরোধীদলের বিধায়ক থাকাকালীন নানা বিতর্কেই জড়িয়েছেন আপনি। নোদাখালির ওসি-কে গালিগালাজ করে থানায় তালা লাগিয়ে দেওয়া, বজবজে স্বাস্থ্য আধিকারিককে হুমকি দেওয়া বা বিধানসভার লবিতে ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িয়ে গিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্দেশে অশালীন শব্দ প্রয়োগ— এ সবেই খচিত হয়ে আছে আপনার অতীত। কয়েক মাস আগে হাওড়ার গোলাবাড়ি এলাকার এক আবাসনে ঢুকে চিকিৎসক পিতা-পুত্রকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল আপনার বিরুদ্ধে। সেটাও তো ডেপুটি স্পিকার হওয়ার পরে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, প্রকাশ্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোনো মহিলা ডেপুটি স্পিকার তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শিবিরের কারও সম্পর্কে এমন বলতে পারেন কি? আমি বলি পারেন। কুকথার আবার পুরুষ মহিলা কি?

— **সুন্দর মৌলিক**

কয়াভূমিপুত্র যতীন্দ্রনাথ

চন্দ্রমৌলী উপাধ্যায়

অবিভক্ত ভারতের কৃষ্ণনগর জেলায় কলকাতার ঠাকুর পরিবারের প্রিন্স দ্বারকানাথের জমিদারি ছিল বিরাহিমপুর পরগনা। গড়াই নদীর তীরে এই পরগনারই অন্তর্গত একটি গ্রাম হলো কয়া। কয়া গ্রামটি বর্তমানে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামের চট্টোপাধ্যায়রা ছিল সে যুগের একটি ক্ষমতাশালী, প্রগতিশীল পরিবার। দেবেন্দ্রনাথের আমলে বিরাহিমপুরে প্রজাবিদ্রোহ শুরু হলে তিনি চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কর্তা রামসুন্দরের শরণাপন্ন হন। রামসুন্দর দক্ষ হস্তে সেই পরিস্থিতি সামাল দেন। এর ফলে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা তিন পুরুষ দৃঢ়ভাবে বজায় ছিল।

এই রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র মধুসূদনের দ্বিতীয় সন্তান কন্যা শরৎশশী। শরৎশশীর বিবাহ হয়েছিল তৎকালীন ঝিনাইদহ মহকুমার হরিণাকুণ্ড থানার রিসখালী গ্রামের উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নবগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত রিসখালীতে এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের সম্বল ছিল কেবল কয়েক বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমি। যতীন্দ্রনাথের জনৈক আত্মীয় উমেশচন্দ্রের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— 'অবস্থা তাঁর উঁচু ছিল না; কিন্তু মাথা ছিল উঁচু।' রিসখালী গ্রামের কাছেই সিঁদরে গ্রামে একটি নীলকুঠি ছিল। সেই কুঠির কুখ্যাত কুঠিয়াল ছিলেন মি. শেরিফ। প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্ধর্ষ এই কুঠিয়ালের সামনে যে কেউ পড়লেই তাকে মাথা নীচু করে সেলাম করতে হোত। জমিদার, জোতদার, গাঁতিদারেরা পর্যন্ত পালকি থেকে নেমে সেলাম করত। কিন্তু মাথা নীচু করতেন না ওই উমেশচন্দ্র। 'সে-যুগে এরকম প্রবল-প্রতাপান্বিত দুর্ধর্ষ নীল-কুঠিয়াল সাহেবের কাছে যে মাথা নীচু হোত না, সে মাথা যে কতখানি উঁচু ছিল আর তার অধঃস্থ মেরুদণ্ডটি যে কতখানি শক্ত ছিল, আজকের দিনে তার যথার্থ ধারণা করা কঠিন। সে মাথা গুঁড়বে, তবু আনত হবে না; সে মেরুদণ্ড ভাঙবে, তবু দোমড়াবে না।' উমেশচন্দ্রের স্ত্রী শরৎশশীও ছিলেন একজন অশেষ গুণবতী মহিলা। কন্যা বিনোদবালা তাঁর মার সম্পর্কে লিখেছেন— 'মাতা শরৎশশী দেবী একজন আদর্শ নারী ছিলেন। তিনি শিক্ষিতা, গৃহকর্ম ও শিল্পকর্ম নিপুণা, পরসেবাপরায়ণা, দয়াদ্র হৃদয়া এবং দানশীলা ছিলেন এবং পরম ধার্মিক ছিলেন। দরিদ্র প্রতিবেশীকে অনেক সময় আপনার আহার্য বস্তু নিজে না খাইয়া খাওয়াইতেন এবং কত সময় তাঁহার

ষ্ট্যাচু : অশ্বারোহী যতীন্দ্রনাথ।

দ্বারে ছিন্ন বস্ত্রধারী ভিখারী উপস্থিত হইলে আপনার পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্যন্তও দান করিয়াছেন। তিনি পদ্যে সীতা সরমা প্রভৃতির আখ্যায়িকা এবং অনেক উচ্চ ভাবাপন্ন ও স্বদেশানুরাগ পূর্ণ কবিতাবলী লিখিয়াছেন।' মুখোপাধ্যায় দম্পতির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমূহ তাঁদের কন্যা বিনোদবালা এবং পুত্র জ্যোতিন্দ্রনাথের (বাঘাযতীন নিজের নামের এই বানান লিখতেন) উপর গভীর রেখাপাত করেছিল।

সে যুগের প্রথানুসারে কয়ার পিত্রালয়ে ১২৮৬ সালের ২১ অগ্রহায়ণ, বুধবার (৮ ডিসেম্বর, ১৮৭৯ অব্দ) শরৎশশী পুত্র যতীন্দ্রনাথের জন্ম দেন। যতীন্দ্রনাথের পাঁচ বছর বয়সে ১২৯০ বঙ্গাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। বড়দাদা বসন্তকুমারের সনির্বন্ধ অনুরোধে শরৎশশী পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে এসে ওঠেন পিতৃগৃহ কয়াগ্রামে। বসন্তকুমার পরবর্তীতে এঁদের বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণও করে দিয়েছিলেন।

মাতুলালয়ে থেকেই ছোট্ট যতীন্দ্র কৈশোরের পথে পা বাড়ালো। তাঁর মনে প্রভাব পড়ল কয়া গ্রামের পারিপার্শ্বিকতার এবং একই সঙ্গে তাঁর মায়ের ব্যক্তিত্বেরও। দিদি বিনোদবালার ভাষায়— 'বাল্যকালে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা জননীর নিকট হইতে তিনি প্রাপ্ত হন। মাতা, পুত্রের বাল্যজীবন হইতেই তাহাকে আসক্তি ত্যাগ, নির্ভীকতা, আত্মনির্ভরতা ও সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সর্বদা শিক্ষা দিতেন এবং এই

সকল ভাবের আদর্শ তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতেন, পরিচালনা করতেন।'

কয়াগ্রামের যতীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কিছু ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রনাথের মাতুলালয়েই ছিল গ্রামের ডাকঘর। মেসোমশাই হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেই ডাকঘরের পোষ্টমাস্টার আর ভুঁইমালী ছিল ডাক-হরকরা। যতি দিনের পর দিন তাঁকে নানা প্রশ্ন করে। যেমন— ভুঁইমালী দা হাতের সড়কি দিয়ে কি করে। ভুঁইমালী তাকে জানায় প্রয়োজনে তা দিয়ে শূয়োর, সজারু এমনকী বাঘ পর্যন্ত মারা যায়। এরপর তার প্রশ্ন সন্ধ্যার পর বিন্দীপাড়ার ঘাটের শ্মশানে সে ভূতের ভয় পায় কিনা। ভুঁইমালী বলে, ভূত-প্রেত সব মিথ্যাগল্প, বানানো কথা। ওসব কিছু নেই। বালক যতির মাথায় ঢুকে যায় সে কথা। সে ভাবে এর আগে সে তারও ছোটবেলায় কুকুরকে ভয় পাওয়ায় মা'র কাছে বকুনি খেয়ে শিখেছিলেন, বিপদে পড়লে তার সম্মুখীন হয়ে তাকে মোকাবিলা করতে হয়, পালাতে নেই। না হলে লোকে ভিতু বলে।

গ্রামের পূর্বদিকে গড়াই নদীতে ইস্টার্ন-বেঙ্গল রেলওয়ের ব্রীজ তৈরি হয় ১৮৭০ অব্দে। সেই বিশাল, অতল খরস্রোতা নদীর উপর ব্রীজ তৈরি হলো কিভাবে, তা যতীন্দ্রের মনের প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তরে তাকে বড়রা জানায় ব্রীজ তৈরি করার সময়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভীষণ লড়াই চলেছিল। তার থেকেও ভয়ানক যখন মজুরেরা স্রোতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন সাহেবরা গুলি করে দশ-বারো জন মজুরকে মেরে ফেলে। সে কাহিনি শুনে যতি রেগে যায়। বলে— বড় হয়ে আমি এর প্রতিশোধ নেব। গুলি করে সাহেবদের মারব।

গড়াই-কে ঘিরে যতির জীবনে অনেক গল্প, অনেক কাহিনি। বর্ষাকালে গড়াই-য়ের মূর্তি হয় ভীষণা, ভয়ঙ্করী, তারই সঙ্গে নদীতে কুমিরের ভয়ে কেউ একা নামতে সাহস করে না। স্নান করে দলবদ্ধ হয়ে। কিন্তু যতির মায়ের কথা স্বতন্ত্র। অল্পবয়স্কা বিধবা শরৎশশী বর্ষাকালেও নিত্যস্নানে আসেন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ছেলেকে জলে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে দেন। কেউ প্রশ্ন করলে বলেন— 'ও আমার বেটা-ছেলে। তুচ্ছ গড়াই

যুবক যতীন্দ্রনাথ।

নদীকে ভয় করবে কেন ও?'

যতির বয়স তখন আট কি নয়, যতির ন'মামা অনাথ বন্ধুর সাদা ঘোড়ার নাম ছিল সুন্দরী। যতি ঘোড়ায় চড়া শিখতে শুরু করল। সুন্দরীর পিঠে জিন্ নেই, মুখে লাগাম নেই, যতি তার উপরই সওয়ারী করত। যতীন্দ্রের বড়মামা বাড়ির ছেলেদের কুস্তি শেখাবার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফেরাজ খানকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। যতির কুস্তি শেখা শুরু হয়েছিল কয়ার কাছে গট্টিয়ার ওস্তাদ যাদু মাল কুস্তিগীরের আখড়ায়। ফেরাজও শেখায় যতিকে কুস্তি। একই সঙ্গে সে শোনে ফেরাজের স্বাধীনতা প্রিয় জাতির কথাও। পরবর্তীতে যতীন্দ্র কলকাতায় দীর্ঘ দিন কুস্তিগীর অম্বু গোহের (গোবর) পুত্র ক্ষেত্রনাথ গোহের কাছেও কুস্তি অনুশীলন করেছিলেন। সেখানেই পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সে যুগের বিশিষ্ট লেখক-চিন্তাবিদ্ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের পুত্র শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দিদি বিনোদবালা লিখেছেন— শচীন্দ্রের সংস্পর্শে এসে যতির 'সাহস এবং বল বহুল পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল।'

ইতিমধ্যেই কয়ায় ছেলেদের দলের পাণ্ডা হয়ে উঠেছে যতি। মধুর স্বভাব, সত্যবাদিতা, সুন্দর সুঠাম চেহারা, সরল হৃদয় আর শুভবুদ্ধির জন্য তার গ্রামেও অত্যন্ত খাতির। তার সাহসের জন্য ছেলেরা তাকে সমীহও করে।

কেটে গেল অনেকটা সময়। কৃষ্ণনগর এ. ভি স্কুলে পাঠ শেষ করে যতি কলকাতার কলেজে ভর্তি হলেন। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে যতীন্দ্রের অন্তরে এসে পৌঁছতে লাগল এক অভিনব অপূর্ব সঙ্গীত। এই অস্ফুট সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁকে বারে বারে উন্মনা-উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলতে লাগল। অনিত্য সংসারের প্রতি নিরাসক্ত সেই বাঁধনছেঁড়া যৌবন ছিল যতীন্দ্রনাথের। তাঁর জনৈকা আত্মীয়া সে সময়ের যতির অনুভূতি বর্ণনা করেছেন, কাব্যিক ভাষায়— 'যতি যেন এই সময় কেমন-কেমন হয়ে উঠল। তার চোখে-মুখে কপালে যেন কেমন একটা অপূর্ব আবেশের আবির মাখানো থাকত। নূতন বৌ স্বামীর সোহাগ পেয়ে যেমন একটা অদৃশ্য পুলক-চাঞ্চল্য-শিহরণ সর্বাঙ্গে অনুভব করে, চেষ্টা করেও তাকে সম্বরণ করতে পারে না, অপরের চক্ষুতে ধরা পড়ে যায়, যতির মধ্যেও একটা সেইরকম অবস্থা দেখতে পেতাম।'

বা তিনি বলতেন— 'যতি যে সাধারণ মানুষ নয়, এই সময়ে তা বুঝতে পারতাম। সে যেন সর্বদাই বহু দূরের কি এক বাঁশীর ডাক শুনতে পেত। চোখে মুখে মাঝে মাঝে কি এক অপরূপ জ্যোতি ফুটে উঠত, কেমন যেন উন্মনা হয়ে সে থাকত। কিসের যেন আনন্দে থেকে-থেকে চমকে-চমকে উঠত। বিজয়া দশমীর পরে যতি কোলাকুলি করতে বেরিয়ে সকলকে আলিঙ্গন করত। জোলা, বিন্দী, ভুঁইমালী, কুরি, মুচি— কাকেও সে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন না করে ছেড়ে দিত না।'

বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এত উদ্দাম যৌবন, অকুতোভয় জীবনযাত্রা আর কোনো মানুষে মনে হয় পাওয়া যাবে না। যতীন্দ্রনাথের কাছে জীবন ছিল পায়ের ভৃত্য, তার চিত্ত ছিল সত্যই ভাবনাহীন। আবার অন্যভাবে বললে তাঁর চরিত্র ছিল 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।'

কয়া ছিল যতীন্দ্রের জীবনের জীবন্ত বীক্ষণাগার। জীবনকে সেখানে তিনি ভেঙেছেন-গড়েছেন। চিনতে শিখেছেন কৃত্রিমতা- অকৃত্রিমতা। নিখাদ প্রেমের সন্ধানও তিনি সেখানেই পেয়েছেন। সামনে অগ্রসর হওয়ার 'চরৈবতি' মন্ত্র দীক্ষা ও তাঁর জন্মভূমি কয়া গ্রামেই। কয়াকে কেন্দ্র করে যতীন্দ্রের জীবনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আলোচনা করা যেতে পারে, যাতে যতীন্দ্রনাথ স্বআলোকে আপনি ভাস্বর।

যতীন্দ্রের দৈহিক শক্তি ছিল অসাধারণ আর মনের বল ছিল অতি মানবিক। তাঁর দেহের তার মনের শক্তি একত্র করে তিনি অবলীলাক্রমে যে সকল কাজ করতেন, সাধারণ মানুষ সেসব দেখে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যেত।

একদিন যতীন্দ্র কলকাতা থেকে কয়ার বাড়িতে আসছেন। চাটগাঁ মেল থেকে কুষ্টিয়া স্টেশনে এলে গাড়ি থেকেই দেখেন নদীর ঘাটে একটিও নৌকা নেই। তা দেখে যতীন্দ্রনাথ আর ট্রেন থেকে নামলেন না। খানিকপরে ট্রেন ছেড়ে দিল তার দশ মিনিটের মধ্যে গড়াই ব্রীজ পার হয়ে গেল। ব্রীজ পার হলেই যতি ঘণ্টায় ৪৫ মাইল গতিতে চলা গাড়ির দরজা খুলে ফুট বোর্ডে হাতল ধরে দাঁড়ালেন। ট্রেনটি যখনই কয়ার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জেলা বোর্ডের রাস্তাটি অতিক্রম করবে তখনই তিনি লাফিয়ে নেমে পড়লেন, যেমন মানুষ প্রয়োজনে চলন্ত বাস থেকে নামে।

আর একদিনের ঘটনা। কুষ্টিয়া থেকে গোট্টের ঘাটে যতীন্দ্র খেয়া পার হয়ে বাড়ি আসছেন। নৌকা থেকে নামতেই তিনি দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধা এক বোঝা ঘাস কেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে। বোঝাটা বড় থাকায় সে নিজে তা তুলতে পারছে না। ঘাসের বোঝায় জল-কাদা লেগে থাকায় বৃদ্ধা সকলকে অনুরোধ জানালেও কেউই তা বৃদ্ধার মাথায় তুলে দিতে রাজি নয়। যতীন্দ্র কলকাতা থেকে সেদিন ফিরছিলেন, তাঁর পরনে ছিল ঝক্‌ঝকে স্যুট। বৃদ্ধার অনুরোধ শুনে এক মুহূর্ত চিন্তা না করে যতীন্দ্র বৃদ্ধাকে বলল, এত ভারী বোঝা এই বৃদ্ধ বয়সে তার বওয়া উচিত নয়। এই বলে যতি ঘাসের বোঝাটি নিজের কাঁধে তুলে নিল। বৃদ্ধা তখন সঙ্কোচে, কুণ্ঠায়, লজ্জায় খালি— 'ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লা' বলতে লাগল। যতি সেই ঘাসের বোঝা মাথায় করে এক মাইল পথ হেঁটে ঘাসের বোঝাটি বৃদ্ধার বাড়িতে পৌঁছে দিল। ফেরার আগে দরিদ্র বৃদ্ধার হাতে যদি কয়েকটা টাকাও দিয়ে এল। দিদি বিনোদবালা এ প্রসঙ্গে বলেছেন— 'আত্মস্বার্থ ত্যাগে জ্যোতিন্দ্রনাথ চিরদিনই আনন্দ পাইতেন। তাঁহাকে কেহ মূল্যবান জিনিস দিলে তিনি তাহা অপব্যয় জ্ঞানে বলিতেন যে দেশে যাহারা অনাহারে মরিতেছে তাহাদিগকে এই পয়সাগুলি দিলে তাহারা খাইয়া বাঁচিত। নিঃস্ব দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার্থে আর্থিক সাহায্য এবং অন্ধ-আতুরদিগকে দান করা তাঁহার জীবনের নিত্যব্রত ছিল।'

কয়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ ছিল সে যুগের শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা উদার মনোবৃত্তি সম্পন্ন একটি পরিবার। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই পরিবার ওই আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়। ললিত চট্টোপাধ্যায় (যতির কনিষ্ঠ মাতুল) লিখেছেন— '...বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের লইয়া যে সকল মহিলা-সভা হইয়াছে ও রাখী-বন্ধন প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠানে বাড়ির মেয়েরা উদ্দীপনাপূর্ণ যে সকল বক্তৃতা করিয়াছে তাহা তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের এক নূতন অভূতপূর্ব কাহিনী।'

এই সময় যতি গ্রামের তরুণ বন্ধুদের নিয়ে ওই অঞ্চলে এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত করে। জনসভা, মিছিল ও বিলাতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব চলতে লাগল। এ বিষয়ে তাঁর দিদি মন্তব্য করেছেন যে 'স্বভাবগুণে' যতীন্দ্রনাথের এই ধরনের কার্যকলাপে কেউ তাঁর প্রতি কখন অসন্তুষ্ট হয়নি। বাংলার তৎকালীন মুখ্যসচিব এফ. ডাব্লু. ডিউকের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যতীন্দ্রনাথ ১৯০৮ সালে প্রথম পুলিশের নজরে আসেন। শিলিগুড়ি স্টেশনে বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই-ই তার প্রধান কারণ ছিল। এই সময় থেকেই পুলিশ নজর রাখতে শুরু করে যতীন্দ্রর মাতুলালয়ের উপর। সে কারণেই যতীন্দ্রর ছোটমামার লেখায় পাই--- 'যতীন্দ্রনাথের বাসস্থান বলিয়া কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব ও অন্যান্য ইংরেজ পুলিশ কর্মচারীগণ একাধিকার বাংলার বিপ্লব সংস্রবে কয়া পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন।'

কয়ায় সেই সময় যুবকদের উপর যতীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অকল্পনীয়। তাদের নিয়ে তিনি একটি থিয়েটার দল ও ফুটবল ক্লাব গড়েছিলেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বারোমাস আপামর জনসাধারণের মনে আনন্দের প্লাবন বইত।

যতীন্দ্রের মাতুলালয়ের দুর্গোৎসব সে সময় ওই অঞ্চলে অতি জনপ্রিয় ছিল। এই সময় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার লোক পূজা উপলক্ষে ভোজন করত। পূজার প্রত্যহ দশমন চালের ভাত রান্না করা হতো। যতীন্দ্রনাথ গ্রামের একদল বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির উঠানে উনান তৈরি করে প্রতিদিন ওই পরিমাণ ভাত রান্না করতেন এবং সকলকে পরিবেশন করে খাওয়াতেন। অন্যান্য সব কিছুর মতো এ কাজেও তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না।

বিজয়া দশমীর দিন গড়াই নদীতে কয়া গ্রামের প্রতিমা নিরঞ্জন হোত। সেদিন নদীতে বাচের নৌকাও বের হোত। সমগ্র নদী বাচের নৌকার ধাক্কায় তোলপাড় হয়ে উঠত। যতীন্দ্র নিজেও একটা প্রকাণ্ড নৌকোতে গ্রামের

অসংখ্য ছেলে-মেয়েদের নিয়ে উঠে নিজে হাল ধরে নৌকা চালাতেন। গ্রামের সব ছেলেমেয়েদেরই ইচ্ছা থাকত 'বড়দা' (গ্রামে যতি এই নামেই সর্বজনপ্রিয় ছিল)-র নৌকায় ওঠার। তা সম্ভব না হওয়ায় তিনি পালা করে সকলকে তাঁর নৌকায় তুলতেন।

যতীন্দ্রনাথের নাম যে কারণে বাঘাযতীন হয়, সে কথা বলার সময় এসে গেছে। দিনটা ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৮ চৈত্র। একজন খবর নিয়ে এল কয়া থেকে দুই মাইল দূরে রাধারপাড়া গ্রামে একটি বাঘ এসে কিছুদিন থেকে উৎপাত করছে। এই সংবাদ শুনে যতীন্দ্রনাথ মামাতো ভাই ফণিভূষণকে সঙ্গে নিয়ে বাঘ মারতে যান। অস্ত্র বলতে ফণির সঙ্গে পাখি মারা বন্দুক এবং যতীন্দ্রের সঙ্গে একটি কুক্‌রি (নেপালি ছোরা)। রাধারপাড়া গ্রামে এক আখ ক্ষেতে বাঘ লুকিয়ে ছিল। স্থানীয় লোকজন বাঘকে ক্ষেত থেকে বের করার জন্য সেখানে ঢিল, ইঁট ছুড়তে শুরু করে। লোকেরা যেখানে বাঘ আছে ভেবেছিল আসলে বাঘ ছিল তার উলটোদিকে, যে দিকে যতীন্দ্ররা দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিক থেকে হঠাৎ বাঘ বের হলে ফণি ছর্‌রা গুলি চালায়। গুলি বাঘের চামড়া ছুঁয়ে গেলে আহত বাঘ উত্তেজিত হয়ে সামনে দাঁড়ানো যতীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করে। বিপদে পলায়ন করা যতীন্দ্রের স্বভাব নয়। যতীন্দ্র বাঘের গলা জাপটিয়ে ধরে কুক্‌রি দিয়ে বাঘের মস্তকে বার বার আঘাত করতে লাগল। সেই আঘাতে বাঘ প্রথমে মাটিতে পড়ে গেলেও পরক্ষণেই উঠে সে যতীন্দ্রকে আক্রমণ করল। যতির ডান পায়ের হাঁটুর উপরে কামড়ে ধরে তাকে বিষম আহত করে দিল। তা সত্ত্বেও বারংবার ছুরির আঘাতে যতীন্দ্রনাথ বাঘটি হত্যা করল। তাঁকে যখন রক্তাক্ত শরীরে বাড়িতে আনা হলো তখন তাঁর মুখে হাসি এবং অবিচলিত দৃঢ়তা বিরাজমান ছিল। বিনোদবালা লিখেছেন— 'ক্ষতস্থান হইতে দরদর ধারে রক্ত বিগলিত হইতেছে— তিনি বাড়িতে পৌঁছতেই লোকের স্কন্ধের উপর হইতে মাথা তুলিয়া তাঁহার স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতিকে ধীরে ধীরে অভয় দিতেছেন। জীবনে কখনও কোনো শারীরিক বেদনা বা মানসিক দুর্বলতা জ্যোতিন্দ্রনাথকে অভিভূত করিতে পারে নাই।'

সে সময় যতীন্দ্রের মধ্যম মাতুল হেমন্তকুমার কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ও তাঁর বন্ধু কলকাতার মেডিকেল কলেজের ডাঃ সর্বাধিকারীর চিকিৎসায় যতীন্দ্র ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠে। যতীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বাঘের চামড়াটি ড. সর্বাধিকারীকে উপহার দেন। বাঘের সেই চামড়াটি আজও ড. সর্বাধিকারীর বংশধরদের কাছে কলকাতায় রক্ষিত হচ্ছে। যে কুক্‌রি দিয়ে বাঘ মেরে যতীন্দ্রনাথ বাঘাযতীন উপাধি পান দেশের মানুষের কাছ থেকে তা বর্তমানে রাখা আছে যতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পুত্রদের কাছে।

১৯৪৭ এবং পরবর্তীতে ১৯৭১-এর পর কয়া আর সেই আগের কয়া নেই। ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব হলে শেখ মুজিবুর রহমান চেয়েছিলেন কয়াতে 'বাঘাযতীন মিলিটারী অ্যাকাডেমী' গড়তে। মুজিবের অকাল মৃত্যুতে তাঁর সেই ইচ্ছা কার্যকর হয়নি। যতীন্দ্রের জন্মভিটায় আজ একটি মহাবিদ্যালয় হয়েছে— যার নাম কয়া কলেজ। বাকি জমির বেশিরভাগ আজ খাস হলেও স্থানীয় মানুষদের দখলে। কয়াগ্রাম কিন্তু আজও ভোলেনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীনকে। তারা চায় ওই কলেজের নাম হোক বাঘাযতীন কলেজ। গ্রামের মূল রাস্তার নামকরণ হোক যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরণী।

কয়া শুধু যতীনের জন্মের আঁতুড়ঘর ছিল না, কয়া ছিল তাঁর কর্মের লীলাভূমিও। যতীন্দ্রনাথের যে সাহস, শক্তি, শৌর্য-বীর্য তাঁর

ভারত সরকার কর্তৃক ৯.৯.১৯৭০ সালে প্রকাশিত যতীন্দ্রনাথের ডাকটিকিট।

জীবনকে অলৌকিক রূপে পরিচালিত করেছিল; তার বীজও অঙ্কুরিত হয়েছিল ওই কয়াতেই।

কয়াগ্রামে বাঘাযতীনের সমকালে এক উন্মাদ বাস করত। তার নাম ছিল বুদোপাল। বুদোপাল সারা রাত্রি গ্রামের মৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করে কেঁদে কেঁদে বেড়াত। অনেক সময়ই সে উত্তেজনায় অধীর হয়ে চিৎকার করে শোক কম্পিত কণ্ঠে কেঁদে গান গাইত—

''যতি মুখুজ্যে কোথায় গেল, যতি মুখুজ্যে কোথায় গেল!
কোথায় গেল, কোথায় গেল আর এল না, কোথায় গেল?
যতি মুখ্যুজ্যে হারিয়ে গেল, কয়াগ্রাম আঁধার হল,
ওরে কোথায় গেল, কোথায় গেল আর এল না কোথায় গেল?''[২৯]

নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে সেই উন্মাদের বুকভাঙা কান্না কয়ার সমস্ত মানুষের বুকে সেদিন কেমন যেন আলোড়ন তুলতো। যতীন্দ্রের মৃত্যুর একশো বছর পর কয়ার অনেক কিছু বদলালেও সেই গ্রামের মানুষের মনে আজও যেন সেই ব্যথাই অনুরণিত হচ্ছে। তারা আজও ভুলতে পারেনি তাদের গ্রামের সন্তান বাঘাযতীনের অকাল প্রয়াণ।

তথ্যসূত্র :

১. পারিবারিক কথা—ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়। ২. বাঘাযতীন —শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। ৩. বীরকর্মী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত— বিনোদবালা গাঙ্গুলী (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)। ৪. সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৫. বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ—ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়। ৬. Proceedings of the Home Department, March, 1910. ৭. Bagha Jatin–Life and Times of Jatindranath Mukherjee– Prithwindra Mukherjee.

তিনি মরলেন, দেশ জাগলো ?

অভিরূপ নাগচৌধুরী

''বহু যুগ ধরে বিদেশীর অধীনে থেকে আমরা গোটা জাতিটাই হীনবীর্য হয়ে গিয়েছি। আমাদের যুবশক্তি যে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেশের জন্যে সত্যের জন্যে আদর্শের জন্যে লড়তে জানে— আমাদের পরবর্তী যুগে যারা এ দেশের মাটিতে জন্মাবে, তাদের জন্যে এই গর্বটুকু করবার অধিকার আমরা দিয়ে যাব। অনাগত দিনের নতুন সৈন্যবাহিনীর জন্যে আমরা পথ বেঁধে দিয়ে যাব। আমাদের এই পথেই তারা এগিয়ে যাবে মুক্তির সংকল্প সার্থক সফল করে।'' —বাঘা যতীন

ব্রাহ্মণ-সন্তান যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রমাণ সাইজের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মারতে বিশেষ কোনো ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী হতে হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। বন্যপ্রাণ-প্রেমীদের কাছে এই ঘটনা কতটা মর্মবিদারক তা উপলব্ধির ক্ষমতাও আমাদের রয়েছে। কিন্তু বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে যতটা না পরিচিত, বাঘা যতীন নামের বিপ্লবীটি আমাদের কাছে বোধ হয় অনেক বেশি সুপরিচিত। বন্যপ্রাণী-প্রেমীরা এই উপমায় নিশ্চয়ই খুশি হবেন যে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ে যতীন্দ্রনাথ বাঘের মতোই মৃত্যুবরণ করলেন। যে শৌর্য ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা তিনি দেখালেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

'হুম গড লাভ'স, ডাই ইয়ং'। ভগবান যাকে ভালোবাসেন, তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। এই নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। আর এটা যে 'নিয়ম'-ই, এমনও তো কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে বলেনি। তবে কি না এহেন নিয়মের মধ্যে দিয়ে ভগবানের ভালোবাসা যে স্বামী বিবেকানন্দ এবং যতীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল, সেটা ভাবতে ভালো লাগে। চল্লিশ পেরোনোর আগেই দু'জনের জীবনাবসান হয়েছে। সেই অর্থে এই দু'জনকেই ভারতবর্ষের তারুণ্যের প্রতীক বলা চলে। বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের সূত্রে বিবেকানন্দের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের আলাপ। কলকাতায় মহামারী প্লেগের রিলিফের কাজে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হবার সুযোগ পেল। যে আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ একশোজন যুবকের সন্ধান করেছিলেন বিবেকানন্দ সমাজকে, রাষ্ট্রকে পালটে দেওয়ার জন্য; সেই একশোজনকে না পাওয়া গেলেও বিবেকানন্দের চাহিদা মতো একজনকে অন্তত পাওয়া গেল— তিনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নিবেদিতার দৃষ্টিতেও বিষয়টি এড়ায়নি। যিনি বলেছিলেন : ''একটি যুবক আমার কাছে এসেছিল যার একটি পরিকল্পনা

যুব-ভারতকে সন্নিবেশিত করার পথে স্বামীজী'র নামকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যুবকটি তাঁর সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী এবং সে নিজেও একজন শক্ত-সমর্থ যুবক। সে স্বাধীন এবং একজন ব্রাহ্মণ।'' এই ব্রাহ্মণটির নাম অবশ্য তাঁর পত্রে কোথাও উল্লেখ করেননি নিবেদিতা। কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে তিনি কার কথা বলতে চাইছেন। এই ধান ভানতে শিবের গীতের প্রয়োজন রয়েছে। যাঁর প্রিয় উক্তি ছিল— 'আমরা মরব দেশ জাগবে'। সেটা যে কোনো সারবত্তা-হীন বুলি ছিল না, তাঁর শহীদ-শতবর্ষে বিষয়টি উপলব্ধি করার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে দরকারি আরও দু' একটি বিষয় বলে নেওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গটি অবশ্যই, জগতের ইতিহাসে নেহাত-ই দুর্লভ একটি অসম যুদ্ধে বাঘা যতীন আর তাঁর চার সহযোগীর

বুড়িবালামের অমর সৈনিক বাঘা যতীন।

অবিশ্বাস্য অবিস্মরণীয় সংগ্রাম এবং বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া শব্দটিই এখানে বলতে হয়— শেষ পর্যন্ত হার না মানা লড়াইয়ে বীরের মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন। গোরা ঠেঙাতে যতীন্দ্রনাথ বরাবরই সিদ্ধহস্ত। এক্ষেত্রে তাঁর ওয়ার্ল্ড রেকর্ড না হোক স্টেট রেকর্ড অন্তত রয়েছে, এটা বলা যেতেই পারে। আর বিবেকানন্দের মতো যেটা তিনি পেয়েছিলেন সেটা হলো হৃদয়। সন্ন্যাসী ও বিপ্লবীদের মধ্যে পৃথিবীর আর সব বস্তু থাকতে পারে কিন্তু যেটা থাকতে পারে না সেটা হলো হৃদয়— এমন ধারণা বলবৎ হওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজনীয় সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই ধারণার এযাবৎকালে সবচেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছেন বিবেকানন্দ এবং যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এবং অবশ্যই এঁদের অনুচরবৃন্দেরাও। যতীন্দ্রনাথের প্রসারিত হৃদয়ের সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা অবশ্যই বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে, নজরুলের ভাষায় 'নব-ভারতের হলদিঘাট'-এ নিহিত ছিল। এই বিষয়টি সবশেষে আলোচিত হবে। তার আগে মূল প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে সেরে ফেলা যাক।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসের শেষে কলকাতা ছাড়তে একপ্রকার বাধ্যই হন বাঘা যতীন। এই বছরের গোড়াটি আক্ষরিক অর্থেই বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটনাবহুল। তাঁর মাথার দাম তখন অনেক। একবার ধরিয়ে দিতে পারলেই নগদানগদি পুরস্কার আর বহু ইনাম মিলবে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে। ইনস্পেকটর সুরেশ মুখার্জি ও গোয়েন্দা নীরদ হালদারকে তিনি আর তাঁর সহযোগীরা যমের দক্ষিণ দুয়ারে পাঠিয়ে দেওয়ায় বৃটিশ সরকারের পুলিশ তখন হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রথমে বাগনানে সেখানকার স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে ও পরে মহিষাদলে কিছুদিন আত্মগোপন করে থেকে বুঝলেন এই বঙ্গে তাঁর নিরাপদ ডেরার সন্ধান ক্রমেই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই অধুনা ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের বন-বনানী ঘেরা নির্জন পল্লী কপ্তিপদায় নির্জন আস্তানার খোঁজে চললেন যতীন্দ্রনাথ। তাঁর অবশ্য এছাড়া একটা অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। বঙ্গোপসাগরে জার্মান জাহাজ আসবে এই আশা তিনি করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর চার তরুণ সহযোগী— চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং জ্যোতিষ পাল। কপ্তিপদা বালেশ্বর শহর থেকে মাইল তিরিশেক দূরে। এখানেই আস্তানা গাড়লেন বাঘা যতীন ও তাঁর সহযোগীরা। এখানে বন্ধু ও হিতৈষী হিসেবে তিনি পেলেন ময়ূরভঞ্জের দেশহিতৈষী পুলিশ ইনস্পেকটর কেদারনাথ চক্রবর্তীর সুসন্তান মণীন্দ্র চক্রবর্তীকে। স্থানীয় গোপাল ডিহায় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করলেন অন্তরের সন্ন্যাসী যতীন্দ্রনাথ। তাঁর আশ্রমটি সাধুবাবার আশ্রম নামে পরিচিত হলো। দুঃস্থদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে অনাথদের শিক্ষাদান সমস্ত কর্মকাণ্ডই চলত সেখানে। মায় দুর্ভিক্ষের সময় অকাতরে সেবা অবধি।

কিন্তু এর পাশাপাশি সংগোপনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডও অক্ষুণ্ণ ছিল। তার বিস্তারিত বিবরণের সময় ও সুযোগ এখানে বিশেষ নেই। আমরা দ্রুত ক্ল্যাইম্যাক্সের দিকে এগোব। কলকাতায় বাঘা যতীনের সন্ধানে পুলিশ তখন হন্যে। বিভিন্ন সূত্রে কপ্তিপদার ওই আশ্রমের খবর পুলিশের কানে পৌঁছেছিল। তার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জি জি ডি ডেনহ্যাম, তৎকালীন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার কুখ্যাত চার্লস টেগার্ট ও সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এল এন বার্ড ৪ সেপ্টেম্বর এসে পৌঁছলেন বালেশ্বরে। সেখানকার ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে তার পরদিন তল্লাশি-র সময় একটুকরো কাগজে 'কপ্তিপদা' নামটি দেখে বাঘা যতীনের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হন।

দু'একদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গেল সপার্ষদ যতীন্দ্রনাথকে ধরার পরিকল্পনা। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তখন দিব্যচক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন

করে ফেলেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : শ্রদ্ধার সঙ্গে একবার যিনি যোগের পথে পা বাড়িয়েছেন, তাঁর তো কোনো বিনাশ নেই। না, বিনাশ তাঁর হলো না। দিনটা ছিল ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫। তিনশো জন গোরা সৈন্যের বিরুদ্ধে পাঁচ বাঙালি বীরের জগতের ইতিহাসে সম্ভবত অসমতম যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনায় যাচ্ছি না। কেবল বীর বিপ্লবীর বীরত্বের কিছু নমুনা তুলে ধরতে চাইব।

প্রথমে বলি তাঁর সহযোগীদের কথা। বহু গোরা-সৈন্যকে নিধন করার পর যতীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-হস্ত চিত্তপ্রিয় গুলির আঘাতে নিহত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে শোক করা যদিও নিয়ম নয়, কিন্তু প্রসারিত হৃদয় যতীন্দ্রনাথ নিজের দেহে গোটা চারেক গুলি সহ্য করে বুঝতে পারেন শেষ সময় উপস্থিত। কারণ কার্তুজ-ভর্তি শেষ চামড়ার থলিটি চাবির অভাবে এবং বেশি পুরু হওয়ায় আর কিছুতেই খোলা যাচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন : 'গুলি বন্ধ কর, সাদা রুমাল ওড়াও।' এই প্রথম তাঁর অধিনায়কের নির্দেশ অমান্য করলেন নীরেন্দ্র : 'না, মরার আগে পিস্তল বন্ধ করব না।' মনোরঞ্জনও বললেন : 'না, তা হতে পারে না, শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ একটি গুলিও থাকবে, আমরা লড়ব।' দেশের বিপ্লবীয়ানায় এ-দৃষ্টান্তের নেহাত-ই অভাব যে মৃত্যুপথযাত্রী অধিনায়ক তখনও তাঁর সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে মরিয়া। আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি শুধু বললেন : 'I order, stop firing। আমি তোমাদের মরতে দিতে পারি না।' পরের দিন হাসপাতালে মৃত্যুশয্যাতেও টেগার্টকে তিনি বলেছিলেন : 'বাংলার মানুষকে বলবেন চিত্তপ্রিয় রায় এবং আমি বাংলার সম্মানের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করলাম।' একথা টেগার্টের বলার দায় ছিল না। ভেবে শুধু খারাপ লাগে এই মানুষদেরই ডাকাত হিসেবে ধরিয়ে দেওয়ার নেশায় মেতেছিল কপ্তিপদা ও আশপাশের কিছু মানুষ। এই বিশ্বাসঘাতকতা যেন আমাদের রক্তে। তাই যতীন মুখুজ্যে আর তাঁর সহযোগীদের রক্তের ঋণ আমরা আজও শোধ করতে পারিনি।

তথ্যঋণ :

১. 'সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ' : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রথম পর্যদ সং, ১৯৯০। ২. 'বাঘা যতীন' : মণি বাগচী, কলকাতা, ১৯৬৮। ৩. 'সমসাময়িকের চোখে বাঘা যতীন' : সম্পা—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার গুপ্ত। সাহিত্য সংসদ। ২০১৪।

'এভাবে এমন এক শ্রেণীর নারী সৃষ্টি হবে যারা নারীজাতির সকল সমস্যার সমাধান করবে। কর্মক্ষেত্র ব্যতীত তাদের কোন গৃহ থাকবে না, ধর্মই হবে তাদের একমাত্র বন্ধন, এবং ভালবাসা থাকবে কেবল গুরু, স্বদেশ ও জনগণের প্রতি।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ ও স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী

স্বামী প্রেমানন্দ গিরি

অগ্নিমন্ত্রে লভি দীক্ষা শ্রীগুরুচরণে,
অমর জীবন তব দুর্লভ মরণে।।

সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী মহারাজের একজন প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। এই ক্ষণজন্মা তেজস্বী নিষ্কাম কর্মবীরের জীবনী অলৌকিক ও অতি অপূর্ব। প্রত্যেক বঙ্গ নরনারীর যতীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করা কর্তব্য। তাহার হৃদয়ে যে স্বদেশ-প্রেম ছিল তাহা ভগবৎ-প্রেমেরই নামান্তর। বিজাতীয় শাসন শোষণের প্রতি যে বিদ্বেষ ছিল, তাহা পাপের বিরুদ্ধে ঘৃণা। একাধারে যতীন্দ্রনাথ ভগবদভক্ত, পরোপকারী, স্বজনবৎসল, সরল তেজস্বী বীর ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তের তূর্যনাদে দেশসাধনার উদাত্ত আবাহনে যে সমস্ত মৃত্যুঞ্জয়ী সাধক দেশজননীর পাদমূলে আত্মাহুতি প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যতীন্দ্রনাথের স্থান তাহাদের সকলের ঊর্ধ্বে। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

পরিবারের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ।

এই মহাপ্রাণ বীর স্বদেশের উদ্ধারকল্পে জাতির অন্তরে স্বাধীনতার নব চেতনা ও আকাঙ্ক্ষাকে স্ফুরিত করিবার জন্য, সম্মুখে সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়া যে সাধনার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যৎবংশধরগণ ত্যাগের মানদণ্ডরূপে বরণ করিবে। যতীন্দ্রনাথের জীবনে তাহার গুরুদেব স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিক্ষা দীক্ষা ও প্রভাব কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল— তাহা সুধীরকুমার মিত্র প্রণীত 'বাঘা যতীন' নামক পুস্তক ও তাহার গুরু-ভ্রাতাগণের মুখে শুনিয়াই বর্তমান প্রবন্ধ লিখিতে হইতেছে।

যতীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই নির্ভীক, সাহসী ও শারীরিক বলের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার গুরুভক্তি ও মাতৃভক্তি ছিল অসীম। তিনি স্বহস্তে অস্ত্র সাহায্যে ব্যাঘ্রকে পরাভব করিয়া নিহত করায় বাঘা যতীন নামে বিখ্যাত হয়েন।

১৯০১ সালে স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট যতীন্দ্রনাথ দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুদেব যতীন্দ্রনাথের সামর্থ্য, প্রকৃতি ও সাহসিকতার জন্য আদর করিয়া 'শের কা বাচ্চা' (বাঘের বাচ্চা), সূরবীর বলিতেন। বলাবাহুল্য যে শ্রীমৎস্বামী ভোলানন্দ গিরির প্রদত্ত নামই পরে সমগ্র দেশে প্রখ্যাত হয় এবং তিনি 'বাঘা যতীন' এই নামের সার্থকতা দেশবাসীকে দেখাইয়া যান।

স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী অদ্বৈত বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন। বেদান্ত সাধনায় 'দাসসুলভ' মনোভাবের আদর নাই, বরং উহার বিরোধী উপদেশই আছে 'মা তে লঘুমাদদীত' —তুমি নিজকে ক্ষুদ্র মনে করিও না। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ' প্রভৃতি বেদান্ত বাণী মহাভারত ও গীতাতে পাওয়া যায়। ইসলাম ও খ্রিস্টীয় সভ্যতাতেই ধর্মের নামে 'দাস্যভাব'— আর্য জাতির ভিতর এই ভাবধারা সম্প্রসারণ ঘটাইয়া অনার্যভাবে দুর্বলতা আনয়ন করিতেছে। এই ভাবধারাকে পরিত্যাগ না করিলে জাতির মঙ্গল নাই। স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী পরমাত্মবাদী জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী হইলেও দেশের ও জাতির এই দুরবস্থা দর্শনে উদাসীন ছিলেন না। জনসাধারণের মানসিক, আধ্যাত্মিক, ব্যবহারিক দুর্দশা দর্শনে সকলের জন্য বেদান্ত প্রচারই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। যোগ্য পাত্র দেখিলে তাহাকে স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলকল্পে সৎসাহ দিতেন ও সৎকর্মে নিয়োজিত করিতেন।

স্বামীজীর শিক্ষাদীক্ষায় মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি যতীন্দ্রনাথে দেখা দিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ সাধারণত গভীর রাত্রে ২১১নং হ্যারিসন রোডে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। উভয়েরই নিভৃত আলোচনা অপর কেহ জানিতে পারিত না। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে স্বদেশসাধনায় যতীন্দ্রনাথ শ্রীগুরুদেবের সম্পূর্ণ অনুমোদন লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে সাদা চামড়ার অত্যাচার অপমানের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করিবার সাহস কাহারও ছিল না; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ অনেক ইংরাজকে এমন শিক্ষা দিয়াছিলেন যে তাহারা তাহা জীবনে কখনো ভুলিবে না। একবার হুইলার সাহেব যতীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি ক-জনের সঙ্গে লড়িতে পার?' যতীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'ভালো মানুষ এক জনের সঙ্গেও লড়িতে পারি না, কিন্তু অসংখ্য বদমাইসের সঙ্গে লড়িতেও ভয় পাই না।'

ভোলানন্দ-চরিতামৃতকার স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরিজী লিখিয়াছেন— ''একদা যতীন্দ্রনাথ সদলবলে ব্যাঘ্র শিকার করিতে গিয়া ব্যাঘ্রকর্তৃক আক্রান্ত হন, সকলে পলায়ন

করিল, নির্ভীক যতীন্দ্রনাথ হস্তস্থিত সড়কি নিয়া ব্যাঘ্রের সহিত যুঝিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র ভীমবিক্রমে আক্রমণ করিয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল। এই বিপদে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন, অভয়দাতা করুণাময় শ্রীশ্রীস্বামীজী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তেজোদৃপ্তকণ্ঠে বলিতেছেন— বেটা ভয় নাই, বাঘকে জোরে আঘাত কর, উহার মুখের ভিতর সড়কি মার। স্বামীজীর আবির্ভাবে ও তেজোদৃপ্ত বাণীতে প্রোৎসাহিত যতীন্দ্রনাথের সাহস শতগুণে বর্ধিত হইল। তিনি অমিত বিক্রমে বাঘের মুখের মধ্যে সড়কি পুরিয়া দিলেন। ব্যাঘ্র অচিরে ক্ষীণশক্তি হইয়া ধরাশায়ী হইল। দেখিতে দেখিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে পেছনে তাকাইলেন; কিন্তু স্বামীজী তথায় নাই, তিনি অন্তর্ধান করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিবস্বরূপ গুরুদেব জঙ্গলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন —ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হইয়া যতীন্দ্রনাথ জয় গুরু! জয় গুরু! রবে বনানী প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। ইহার কিছুদিন পরে যতীন্দ্রনাথ হরিদ্বারে উপনীত হইয়া স্বামীজীকে বলিলেন, বাবা! আপনি আমাকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সেই গভীর জঙ্গলে আপনি আবির্ভূত না হইলে সেদিন নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হইত। তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন— দূর বেটা, কী বলছো! আমি তো তখন হরিদ্বারেই ছিলাম। এসব পরমাত্মার লীলা। তোমারই ইষ্টনিষ্ঠায় ইষ্টদেব তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

যতীন্দ্রনাথের ইষ্টনিষ্ঠা কীরূপ প্রগাঢ় ছিল আর একটি ঘটনায় সুস্পষ্ট হইতেছে— যতীন্দ্রনাথ তাহার সাধ্বী স্ত্রী ইন্দুবালা ও ভগ্নী বিনোদবালা-সহ গিরিমহারাজের নিকট মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামীজী দীক্ষান্তে প্রত্যেক শিষ্যকে একটি মন্ত্রপূত রুদ্রাক্ষ কণ্ঠে পরাইয়া দিতেন। ১৯১০ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্রের মামলায় ধৃত যতীন্দ্রনাথকে জেলের কর্তৃপক্ষ রুদ্রাক্ষটি জমা দিয়া জেলের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া জিদ ধরিল। বাঘা যতীন রুদ্রাক্ষ কোনো মতেই খুলিবে না, ইহাতে সিপাহীগণ জেলারকে ডাকিয়া আনিল। জেলার সাহেব যতীন্দ্রনাথকে রুদ্রাক্ষটি খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ উহা খুলিতে রাজি হইলেন না। জেলারের সঙ্গে ভীষণ তর্কাতর্কি চলিতে লাগিল—জেলার বল প্রয়োগে রুদ্রাক্ষটি খুলিতে হুকুম দিলে, শৃঙ্খলিত যতীন্দ্রনাথ ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন— তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন— খবরদার, কেহ আমাকে স্পর্শ করিও না, জীবন থাকিতে কেহ আমার নিকট হইতে উহা লইতে পারিবে না। যতীন্দ্রনাথের চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে কর্তৃপক্ষ রুদ্রাক্ষ-সহ যতীন্দ্রনাথকে জেলে লইতে বাধ্য হইলেন। শুনিতে পাওয়া যায় রুদ্রাক্ষের ভয়ে কেহ যতীন্দ্রনাথের কাছে যাইতে সাহস করিত না।

যতীন্দ্রনাথ বিবাহিত এবং সন্তানাদির পিতা হইয়াও সংসারের মায়ায় আবদ্ধ ছিলেন না। শ্রীমতী বিনোদবালা লিখিতেছেন :

গৃহকর্ম একসাথে করেছি সাধন।
নির্লিপ্ত সংসারী তুমি সাধনের ধন।।
মায়ার বন্ধনে কভু বাধা না পড়িলে।
বিবেক বৈরাগ্য সহ সংসার করিলে।।

এই যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ইহা তিনি তাহার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় লাভ করিয়াছিলেন। দেশ-জননীকে তিনি সর্বতোভাবে জগন্মাতারূপে দেখিয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উপাসক আনন্দমঠের বীর সন্তান জন্মভূমির কল্যাণের জন্য, তথাকথিত ধর্মহীন, ভক্তিহীন, আধুনিক স্বদেশপ্রেমিকতার মিথ্যা ভান করেন নাই। আত্মত্যাগের কষ্টিপাথরে তাহার প্রেম পরীক্ষিত হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন আজন্ম বিশ্বাসী, ভগবদভক্ত গুরুনিষ্ঠ চরিত্রবান বীর সাধক। তাঁহার এই চরিত্রগাথা ভবিষ্যৎ জাতির শিশুগণের নিত্যস্মরণীয় হইবে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতাজীর সহচর শ্রীহরিদাস মিত্র বলিয়াছেন— নেতাজী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন ---আজ যদি বিপ্লবীদাদা যতীন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতেন তবে সকল বাধা মুক্ত হইয়া ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অচিরেই উদিত হইত।

বঙ্গবীর প্রতাপের ন্যায় শৃঙ্খলিতা জননীর বন্ধনের তীব্র বেদনা যতীন্দ্রনাথ হৃদয়ের মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা যতীন্দ্রনাথকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। পাপ অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহী সন্তান ভারতের ইতিহাস রচনায় বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে পঞ্চপাণ্ডবের মতো পঞ্চবীর যুদ্ধ-যজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করিয়া মাতৃপূজায় পূর্ণাহুতি দিয়া গিয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথ তাঁহার ভগিনী বিনোদবালাকে ও স্ত্রীকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে দেশমাতৃকার উদ্ধারের সাধনাকে তিনি ধর্ম-সাধনা নামে অভিহিত করিয়াছিল— 'এই সংসার অস্থায়ী— যে জীবন ধর্মার্থে বিসর্জন করিবার অবকাশ পায়, সে তো ভগবান। ধর্মার্থে বহির্গত ব্যক্তির সাধনা-সিদ্ধির পূর্বে গৃহে প্রত্যাগমন বাঞ্ছনীয় নহে। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের চরণে সর্বদা মতি রাখিবেন। সকলের অপেক্ষা আমাকে যিনি বেশি ভালোবাসেন তিনিই আমাকে রক্ষা করিতেছেন।' স্ত্রী ইন্দুবালাকে লিখিয়াছিলেন---'সর্বদা শ্রীগুরুদেব ও ভগবচ্চরণে তোমার স্বামীর সাধনা সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করিও, হৃদয়ে বল রাখিও।'

সার্থক জীবন যতীন্দ্রনাথের, বস্তুত তিনি যতীন্দ্রই ছিলেন। প্রকৃত নিষ্কাম ত্যাগী সন্ন্যাসী সাধক। সন্ন্যাসী ভোলানন্দ গিরিজীর প্রকৃত সন্ন্যাসী শিষ্য যতীন্দ্রনাথ। বিনোদবালা যথার্থ লিখিয়াছেন—

দুঃখিনী ভারত মাতার দুঃখ বিমোচনে।
কত না করিলে যত্ন অকপট প্রাণে।।
সতত গৌরবে চলি মৃত্যুর সোপানে।
রাখিলে অক্ষয় কীর্তি আত্মবিসর্জনে।।

(সংক্ষেপিত)

যতীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

''সুভাষ এসেছে'' শশাঙ্ক বলে উঠল।

''কে সুভাষ?''

''সুভাষ আমাদেরই একজন, গেল বছর কটক থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় হয়েছে।''

প্রায় তখুনিই হেমন্তের প্রবেশ, তার পিছনে ফরসা এক তরুণ, চোখে চশমা।

'এই যে সুভাষ', শশাঙ্ক বলল।

এগিয়ে এসে সুভাষ আমার হাত দুটো চেপে ধরল, যেন আমার বিষয়ে সে অনেক কথা জানে, আমি যতটা না জানি তার কথা।

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে সে তাকিয়ে থাকল, মুখভরা হাসিতে উজ্জ্বল তার মুখ— বয়সের তুলনায় বেজায় যেন গম্ভীর লাগত সে মুখ।

রাত দশটা তখন বেজে গেছে, তখনকার দিনে ওই সময়েই কলকাতার বন্ধুদের নিয়ে বরিশাল এক্সপ্রেস পৌঁছোত এসে।

দৌলতপুর কলেজে ভরতি হবার দিন কতক পরে গভর্নমেন্ট বিল্ডিং হোস্টেলে আমার ঘরে একদিন সকালে উপস্থিত হলেন অত্যন্ত তরুণ চেহারার এক ভদ্রলোক—অস্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, খালি গায়ে ধুতির খুঁট জড়ানো। জর্জ এলিয়টের 'চ্যানিংস' বইটার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি— সেটা হাতে নিয়ে উঠে বসলাম। আগন্তুক বইটা হাত থেকে নিলেন, খানিক বাদে জিগগেসে করলেন, ''উপন্যাস কেন পড়?''

অপরিচিতের মুখে এমন প্রশ্ন আকস্মিক না? আঁচ করলাম চেহারা দেখে— নির্ঘাত অধ্যাপক হবেন। অত্যন্ত বিনীত ভাবেই আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, ''ক্ষতি কি?''

যে আলোচনার সূত্রপাত করলেন তিনি, খুব যে তাতে তাঁর উৎসাহ ছিল মনে হলো না।

আমার কাঁধে হাত রাখলেন, তাঁর পাশাপাশি আমিও পা চালালাম। নিয়ে গেলেন ওল্ড বিল্ডিং হোস্টেলে তাঁর ঘরে, আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর বন্ধু শ্রীগুরুদাস গুপ্তের সঙ্গে।

তাঁর নাম জানতে পারলাম---ডাঃ যুগলকিশোর আঢ্য, রেকর্ড রেজাল্ট নিয়ে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে সবে এম. বি. পাশ করেছেন। দৌলতপুর কলেজে এসেছেন বোটানির অধ্যাপক আর রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হয়ে। আর, তাঁর বন্ধু পরের স্টিমারেই নড়াল চলেছেন সেখানকার কলেজে অঙ্কের অধ্যাপকপদে যোগ দিতে।

পরে জানলাম ডাঃ আঢ্য এবং প্রফেসর গুপ্ত দুজনেই ডা. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির বন্ধু। সুরেশদা তখন লেগেছেন বিভিন্ন কলেজ থেকে ছেলে ধরার কাজে—বাছা বাছা ভালো ছেলেই। তাঁর ডেরা ছিল অবশ্য কলকাতা। তবে তাঁর শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল কটকে, গিরীশ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে; আর কৃষ্ণনগরে, তার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিল হেমন্ত সরকার। হেমন্ত স্বয়ং গিরীশবাবুর নেকনজরে পড়ে গিয়েছিল একবার কটকে গিয়ে। তখনকার দিনে সুরেশদার সবচেয়ে অপরিহার্য সহকারী ও বন্ধু ছিলেন গিরীশদা, উত্তরকালে যেমন ড. প্রফুল্ল ঘোষ।

সুরেশদাই তাঁর এই কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে যুগলদাকে দৌলতপুরে পাঠান। গোধূলির আগেই সাধারণত যুগলদা আমায় নিয়ে বেরিয়ে যেতেন ভৈরবের তীর বরাবর রাস্তাটা ধরে। কয়েকদিন চলল ধর্ম ও রাজনীতি ঘেঁষা আলোচনা; তারপর হঠাৎ যুগলদা একদিন বলে বসলেন, ''তুমি কি মাখন সেনের সঙ্গে মিশেছ?''—আমি একটু অবাক হলাম তাঁর সঠিক এই অনুমান দেখে, কিন্তু মুখে বললাম ''কেন, বলুন তো?''

''তোমার ভাবনা-চিন্তার ধরন দেখে মনে হয়।'' বাস্তবিকই আমি তার আগে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম--- মাখনবাবু সেই দলের নেতা হলেন পুলিনবিহারী দাসের দ্বীপান্তরের পর! কিন্তু পরে, মাখনবাবু যখন গোটা সংগঠনকেই রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে জুড়ে দেবার চেষ্টায় মাতলেন, নরেন সেন প্রমুখ সমিতির অন্যান্য নেতা তীব্র প্রতিবাদ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার যে রূপটি মাখনবাবু আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন, তা আমার মনে গভীর রেখাপাত করলেও মাখনবাবুর

রাজনীতি যে বাস্তব রূপটি পরিগ্রহ করছিল তা আদৌ পছন্দ হয়নি আমার। সত্যি বলতে কী, আমি দৌলতপুরে চলে গিয়েছিলাম নিজের মনমতো একটা কিছু করবার সংকল্প নিয়েই। আর শিক্ষানবিশ থাকবার ধৈর্য ছিল না তখন। এমনি সময়ে পেলাম আমি যুগলদার সঙ্গ।

সে-যুগের অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার জোরেই আমি যথেষ্ট বিনীত অথচ অকপট চিত্তে যুগলদার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। জানতে চাই, ''আপনার কর্মসূচির কী উদ্দেশ্য?''

''দেশকে আমি স্বাধীন দেখতে চাই।''

''পন্থা?''

''ঠিক জানা নেই। তবে সুরেশ বলে, আমাদের বেদান্ত প্রচার করা উচিত, স্বামীজী (বিবেকানন্দ) যেমনটি শিখিয়েছেন। গোটা জগৎই বেদান্ত ধর্মকে মেনে নেবে। তখন আর আমাদের স্বাধীনতা-লাভের জন্য আলাদা প্রচেষ্টার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। বেদান্ত-ধর্মাবলম্বী ইংরেজ আপনা-থেকে চলে যাবে ভারতবর্ষ ছেড়ে।''

আমার মুখে অবিশ্বাসের হাসিটা যেমন চাপা থাকেনি, যুগলদারও সেটা চোখ এড়ায়নি।

''তোমার আমার বিশ্বাসে তফাত কম। কাজেই, এসো হাতে কলমে কিছু কাজে নামা যাক।

পরের দিন সন্ধ্যা থেকেই আমরা দুজন খেয়া নৌকায় চলে যেতাম নদীর ওপারে। প্রথম দিনেই সেনহাটির গ্রামের পথে পেয়ে গেলাম ভালো মানুষ বুদ্ধিমান চেহারার এক স্কুলের ছাত্র। তার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলে তাকে বলে এলাম কলেজে এসে আমাদের দুজনার কারও সঙ্গে যেন দেখা করে। যুগলদা অধ্যাপক শুনে তখুনি সে রাজি হয়ে গেল।

আরও কিছু কথাবার্তার পর হরিপদ বিষ্ণু— সেদিনের স্কুলের ছাত্রটি— রাজি হলো স্থানীয় স্কুল থেকে যত পারে ভালো ভালো ছেলে জোগাড় করে নিয়ে আসবে আমাদের কাছে। দেখতে দেখতে বেশ ছোটোখাটো একটা দল জুটে গেল। যুগলদার সহকর্মী একজন অধ্যাপক পরিহাস করে এদের ডাকতে লাগলেন JUGAL'S ROUND HEADS নামে। দলের চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিলে গিয়েছিল নামটি। ইতিমধ্যে, যুগলদার সঙ্গে পরিচয়ের কয়েকদিন বাদেই বয়স্ক এক ভদ্রলোক—বয়োভারের চেয়েও ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন বেশ খানিক কুঁজো-হয়ে যাওয়া চেহারা—যুগলদার চাইতেও অদ্ভুত রকমে এসে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। সে বর্ণনা উহ্য রাখি, কারণ ভূমিকা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। পঁয়তাল্লিশ বছরের এই প্রৌঢ় হলেন সেদিনের সুপরিচিত গণ-শিক্ষার প্রচারক শশীভূষণ রায়চৌধুরী, বাড়ি তেঘরা, ২৪ পরগনা। সবে তিনি আমাদের কলেজে এসেছেন হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে। তাঁর কিছু আগে এসেছেন কলকাতা অনুশীলন সমিতি থেকে তরুণমতো তাঁর দুটি সহকর্মী মণীন্দ্রনাথ শেঠ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), আর শরৎ ঘোষ, যথাক্রমে অঙ্ক আর ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে।

স্পষ্টই বোঝা যেত, তাঁদের ওখানে আসবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ছেলে জোগাড় করা। কিছুদিনের মধ্যেই আমার মনে হলো শশীদার কাজকর্মও ততখানিই বিপ্লবোন্মুখ যতখানি সুরেশদার কর্মসূচি ও বিচিত্র চিন্তাধারা। এমনি ধারা আর একটি দলের সংস্পর্শে আমি তার আগে এসেছিলাম, কলকাতায়; দেবপ্রসাদ ঘোষ, হরিদাস মজুমদার প্রমুখ বরিশালের মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সতীশ মুখার্জীর অনুগামীর দল। বহুধা চিন্তার সংঘর্ষমুখর ছিল পথ খোঁজবার সেই দিনগুলি, তারই আত্মপ্রকাশ এই সব দলে।

শশীদার লক্ষ্য ছিল শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং সেই সঙ্গে তেমনি সব শিক্ষক গড়ে তোলা, যাদের হাতে ছড়িয়ে পড়বে বিপ্লবের বীজ দেশের সর্বত্র। নিগ্রো নেতা বুকার ওয়াশিংটনের প্রতি শশীদার ছিল গভীর অনুরাগ।

আমায় তিনি বিশেষ চোখে দেখেছিলেন; আমার জায়গা নির্দিষ্ট হলো তাঁরই ঘরে। ভার দিলেন কলেজ থেকে, বিশেষ করে হোস্টেলগুলো থেকে ছাত্র সংগ্রহের।

এমনি একটা কিছু চাইছিলাম আমি। আর আশ্চর্যজনক ভাবে অত্যন্ত সক্ষম সহকর্মীও জুটে গেলেন। শশীদা আর যুগলদা ছিলেন যেন একই পাখির দুটি ডানা। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় তাঁরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতেন না। যুগলদা আমায় নিষেধ করে দিয়েছিলেন, শশীদার কাছে আমাদের কার্যকলাপের বিন্দুবিসর্গও যেন না ভাঙি; আবার শশীদারও ছিল অনুরূপ নির্দেশ।

অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই এ ভাব কেটে গিয়ে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। সুরেশদার ভারি মনঃপূত হল যুগলদার এখানের কাজ এবং উত্তরোত্তর তিনি যাতায়াত বাড়িয়ে চললেন; তেমনিই যাতায়াত শুরু করলেন তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা : যোগেন সাহা, নৃপেন বোস (পরে অভয় আশ্রমের), হেমেন্দ্র ঘোষ (পরে স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা), যোগেশ সুর (পরে চাঁদপুরে ডাক্তারি করতেন), কৃষ্ণনগরের হেমন্ত সরকার, অরবিন্দ মুখার্জি (প্রথমে খুলনা স্কুলের ছাত্র হিসাবে যুগান্তর দলের চারু ঘোষের সহকর্মী), বিধু রায় (পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক— পদার্থ বিদ্যায়), শশাঙ্ক মুখার্জী (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) এবং—সুভাষ বোস।

শেষোক্ত তিনজনই কটক থেকে এসেছেন। এঁরা তখন সুরেশদার দলের একনিষ্ঠ কর্মী।

ক্রমে ক্রমে সুভাষ সম্বন্ধে আরও কত কথা জানলাম সুরেশদা, যুগলদা, হেমন্ত এবং বিধুর কাছ থেকে। হেমন্ত ছিল খুবই চালাক-চতুর, সহজেই ছেলে পটাতে ওস্তাদ। কটকে যখন ভালো ছাত্র সুভাষকে গিরীশদার মনে ধরে গেল, হেমন্তকে তিনি বললেন, ''জানকী বসুর এই ছেলেটার গলা থেকে টাই-টা খসাতে পারিস?''

''কপাল ঠুকে দেখতে পারি,'' হেমন্ত হেসে জবাব দিয়েছিল।

ক-দিন বাদেই নগ্নপদ সুভাষকে হেমন্ত এনে হাজির করেছিল গিরীশদার সামনে। গিরীশদার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো জীবন

সেদিন সুভাষের মনে পাকা রঙে আঁকা রয়ে গেল। গিরীশদার শিক্ষার মূল কথা ছিল : লজ্জা ঘৃণা ভয় যতদিন ছাড়তে পারছ না, ততদিন তুমি যোগের বা সাধনার অনুপযুক্ত। সাধনার অঙ্গ হিসেবে তিনি রাতের পর রাত কাটিয়েছেন শ্মশানে, শুকুনের সঙ্গে বসে পূতিগন্ধময় শব থেকে মাংস ছিঁড়ে খেয়েছেন। তাঁকে কে অনুসরণ করবে, কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগী ছিল সকলেই, বিশেষত সুভাষ।

সুরেশদা ও গিরিশদার শিক্ষার প্রতিটি শব্দ সুভাষ যেন গিলে খেত, এবং ফলে মন ঝুঁকল সন্ন্যাসের প্রতি। বাস্তবিকই সে বলা নেই কওয়া নেই নিরুদ্দেশ হল। অবশ্য তাকে খুঁজে পাওয়া গেল এবং ঘরেও ফিরিয়ে আনা হল। সে ম্যাট্রিক পাশ করে ভরতি হল প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই পর্বেই শুরু হল তার দৌলতপুর কলেজে যাতায়াত।

শিক্ষাব্রতীরূপে শশীদা বহু বছর কটকেও কাটিয়েছিলেন এবং গোপবন্ধু দাস যখন সত্যবাদী ওপন এয়ার স্কুল খুললেন, শশীদা অনেকখানি প্রেরণা জুগিয়েছিলেন তাঁকে। আদর্শ এই শিক্ষায়তনের প্রত্যেক শিক্ষকই শশীদাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ফলে, গিরীশদা, বিধু, শশাঙ্ক, সুভাষ— সকলেই পরিচিত ছিলেন শশীদার নামের সঙ্গে। দৌলতপুরে এহেন শশীদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাতাই আমার মর্যাদা কমখানি বাড়িয়ে দেয়নি।

কলকাতা থেকে বা অন্যত্র থেকে বন্ধুরা দৌলতপুর কলেজে এলে আমরা তাদের আপ্যায়িত করতাম নৌ-বিহার দিয়ে। ছেলেদের ব্যবহারের জন্য কলেজে দুটো 'নাও' ছিল। সুস্থির হয়ে দাঁড় টেনে সে নৌকা চালানো আমাদের ধাতে ছিল না; তুমুল দাপাদাপি চলত তার বুকে, নৌকাবাঁধা দড়ি দিয়েই জলের বুকেই খেলতাম টাগ অফ ওয়ার, ডুবিয়ে দিতাম নৌকো, তার উলটো-পিঠে চলত হুটোপাটি, তারপর জল থেকে সেই নৌকো টেনে তুলে দাঁড় বেয়ে তীরে ফেরার পালা। তুমুল ঝড়-জলের সন্ধে হলেই খেলা আমাদের জমে উঠত প্রায়শ।

সুভাষের সে-বার বোধহয় দ্বিতীয়বার দৌলতপুরে আসা। সঙ্গে এসেছে বিধু আর শশাঙ্ক, একটা নৌকায় করে ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যুগলদাও ছিলেন। জোয়ারে ভেসে বহুদূর চলে গেলাম। বন্ধুদের সাবধান করে দিয়েছিলাম যে সুভাষ সাঁতার জানে না। তবু তাদের কথায় বিশ্বাস নেই। তাই সুভাষের পাশেই আমি বসেছিলাম। সাঁতারে বেশ দড় ছিলাম সেকালে। স্তব্ধ সন্ধ্যার প্রকৃতি। আকাশে চাঁদ। শশাঙ্ক গাইতে গাইতে চললো— "ও তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে।" অনেক দূরে চলে গেলাম, ফিরতি পথে ভাটার অপেক্ষায়। অস্বাভাবিক রকমে দিব্যি শান্তশিষ্ট ছেলেদের মতোই সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা।

কিন্তু ভাটার টান পড়তে না পড়তে বন্ধুদের শিষ্টতা হঠাৎ উবে গেল। শুরু হল দড়ি ধরে টানা-হ্যাঁচড়ার খেলা। নৌকা গেল ডুবে। সুভাষ জলে পড়ে গেল আমি নজর রেখেছিলাম। সেখানটা অন্ধকার, ছায়া ঘন, তীরের কাছাকাছি তখন আমরা। চট করে সুভাষের কোমরের কাছের ধুতি চেপে ধরলাম। জল সেখানে যথেষ্ট গভীর। টেনে তীরে তুললাম।

ভাটার অনুকূল স্রোতে আমাদের ফিরে আসতে তেমন সময় লাগল না। নৌকা তুলে বাঁধাছাঁদা করছি, ততক্ষণে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষ কোথায় উধাও হয়ে গেল। খুঁজতে শুরু করলাম। কোথাও নেই সুভাষ। শেষ অবধি শশাঙ্ক আর আমি, কলেজের জমিতে মন্দির ছিল একটা, সেখানে গেলাম খুঁজতে। দাওয়ার এককোণে ডাঁই করা ছিল একটা ভাঙা বেড়ার বাঁশে চাটাই। তারই মাঝে খানিকটা আড়াল হয়ে সুভাষ দেখি ধ্যান করছে, দু-চোখে অজস্র ধারা। পরনে ভিজে ধুতি। টেনে তুলে তাকে নিয়ে এলাম হোস্টেলে।

সে-যুগে ভক্তিমূলক গান শুনলে তার চোখে বইত অঝোর অশ্রু। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে সকাল সন্ধে শশীদা প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করতেন। আমরা পাঁচ-ছ জন কখনো-বা দশ-বারোজন উপস্থিত থাকতাম। আমাদের সুর-লয় থাক না থাক, একজন করে শশীদা আমাদের দিয়ে ভক্তিমূলক গান গাওয়াতেন।

সেইদিন বোধহয় সুভাষের প্রথম সকাল ওখানে। উঠতে বেশ দেরি হয়েছিল, আগের রাতের ট্রেনে বন্ধুরা দেরিতে আসবার দরুন। ঘরের আধ-ভেজানো জানলা দিয়ে মিষ্টি রোদ এসে পড়েছিল সুভাষের গালে। সে গাইছিল স্বামী বিবেকানন্দের গান, 'চিন্তয় মম মানস হরি'। গণ্ড বেয়ে ঝরছিল অশ্রু। নতুন গলার সাড়া পেয়ে ছেলেরা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল এবং অপূর্ব সেই বদনের অধিকারীর পরিচয় জানবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে ভিড় জমিয়েছিল।

সুরেশদার ব্যবস্থামতো যুগলদা ইংল্যান্ড চলে গেলেন। শিক্ষা শেষে তিনি কিন্তু বিয়ে করে সেখানেই থেকে গেছেন। কার্লাইলে এখনও তিনি ডাক্তারি করছেন। দৌলতপুরে তাঁর স্থানে এলেন ডাঃ অমূল্য উকিল— যেমন কলেজের কাজে, তেমনি রাজনীতিতেও। সুরেশদার ধারণা ছিল ডাঃ উকিলও ওঁরই লোক বুঝি, কিন্তু আদতে যাদুগোপাল মুখার্জি, শ্রীরামপুরের ডা. আশুতোষ দাস প্রমুখ যুগান্তর দলের কর্মীরাই তাঁকে দল গড়তে পাঠিয়েছিলেন ওখানে।

অমূল্যদা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই তাঁর রাজনৈতিক 'মিশন'-এ হাত দিলেন। আমাদের কর্মসূচি বহুমুখী হয়ে উঠল। কলেজের দরিদ্র ভাণ্ডার নেহাত দরিদ্র অবস্থাতেই আমার হাতে তুলে দিলেন কর্তৃপক্ষ, সেই ভাণ্ডারের জন্যে টাকা তুলতাম স্থানীয় রেলস্টেশন এবং স্টিমারঘাটে কুলির কাজ করে। কলেজকর্তৃপক্ষও সম্ভাব্য সর্বপ্রকার পন্থাতেই আমাদের সাহায্য করতেন। কলেজের মাঠগুলো তাঁরা আমাদের দিয়ে পরিষ্কার করাতেন, মাটি কাটিয়ে গর্ত বুজিয়ে সমান করাতেন, পারিশ্রমিক দিতেন। দেখতে দেখতে দরিদ্র ভাণ্ডারের আয় নব্বই টাকা থেকে পাঁচশততে উঠল; কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগীদের আমরা সেবা শুশ্রূষা করতাম--- শুধুমাত্র কলেজ হোস্টেলগুলোতেই নয়, আশ-পাশের গ্রামগুলোতেও। শশাঙ্ক আর অরবিন্দের মতো বন্ধুরাও সে কাজে হাত লাগাত মাঝে মাঝে।

আরও গঠনমূলক সেবার একাধিক পন্থা

অবিলম্বে দেখা দিল। আমরা তিনজন বন্ধু মিলে অসচ্ছল পরিবারের দুটি সহপাঠীর ব্যয়ভারের ঘাটতি পূরণ করতাম। কলেজের প্রতি হোস্টেলেই একটি করে দরিদ্র ছাত্রের খাই-খরচ চালানোর ব্যবস্থা ওখানে ছিল। দীর্ঘ একটি বন্ধের ভিতর একবার খবর এল যে আমাদেরই এক সহকর্মীর গ্রামের বাড়ি আগুন লেগে পুড়ে গেছে; তার বাবা-মা তার জন্য মাসে দশ টাকার বেশি এখন থেকে আর পাঠাতে পারবেন না। আরেকটি বন্ধুকেও এ-কলেজ ছেড়ে দিয়ে অন্য-একটা কলেজে ভরতি হতে হবে সেখানে সে জনৈক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনোর সুযোগ পাবে। কিন্তু তাকে আমরা দলছাড়া হতে দিতে চাইনে।

বন্ধের সময় সে-বার হোস্টেলে অমূল্যদা আর আমি মাত্র ছিলাম। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর সামান্য আয় থেকে প্রায় আর্ধেক খরচ করেছেন দলের কাজে, আর খরচ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এ-হেন ক্ষেত্রে কী করা যায়, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন যা হোক একটা উপায় ভেবে বার করো। সেদিন রাতেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বলশেভিক বিপ্লবের তখনও তিন বছর দেরি, তখনও আমরা কেউ সোশ্যালিজম বা কম্যুনিজম শব্দটিও শুনিনি। অমূল্যদাকে বললাম : আমরা সব কজন বন্ধু এবং সহকর্মী মিলে কিছু সুবিধা করা যেতে পারে। প্রত্যেকেরই অভিভাবকদের কাছ থেকে যা মাঝে মাঝে আসে একত্র করে তার থেকে কলেজের প্রাপ্য যা যা কেটে নিয়ে বাকি অর্থ দিয়েই আমাদের সব খরচ চালানো যায়। তাতে করে আমাদের খাওয়া- দাওয়া একটা সাদামাঠা হবে। হলেও কিছু এসে যাবে না। পরে বরং আমাদের মেসের লাগোয়া ক্ষেতে শাক-সবজি ফলিয়ে খানিক উপার্জনের ব্যবস্থা করা যাবে।

অমূল্যদা খুব খুশি হলেন। তিনি অধ্যাপক শরৎ ঘোষের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন। তিনি বন্ধ শেষ হবার আগেই ফিরে এলেন; করিতকর্মা লোক তিনি, আমাদের জন্য খেজুর বাগানটার মেসটা তিনি খালি করিয়ে দিলেন— সেখানে আমরা কুড়িজন বিপ্লবী সহকর্মী সিট পেলাম। আমিই প্রথম মাসে মেস পরিচালনার ভার নিলাম। ভালোই চলল, সর্বোপরি আমাদের প্রতিটি সহকর্মীর সোৎসাহ এবং আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে; তারা আত্মোৎসর্গের আদর্শে মন প্রাণ আগেই ঢেলে দিয়েছিল।

দৌলতপুর কলেজের আর একটা দিক ছিল, আজকের কম ছাত্রই যার মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবে। শিক্ষক, ছাত্র সকলেই নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অনাড়ম্বর পল্লীজীবনের প্রতিই ছিল তাঁদের অনুরাগ। আটপৌরে কাপড়, সাধাসিধে খাওয়া-দাওয়াই ছিল তাঁদের সাধ্যের মধ্যে। কত ছাত্রই তো খড়ম পায়ে ধুতির ওপর একটা চাদর জড়িয়ে ক্লাসে আসত। কোনো অধ্যাপক তাতে কোনোদিন বাদ সাধেননি।

এটা আমাদের পক্ষে কম সহায় ছিল না। আমাদের মেসে কয়েকটা ট্রাঙ্ক ছিল, বলতে গেলে যা আমাদের সকলের। তাতে কাচা কাপড়চোপড় মজুত থাকত; যে যখন বাইরে যেত, সেখান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বার করে নিত।

গোটা ব্যবস্থাই সুরেশদা এবং তাঁর সহকর্মীদের— বিশেষত সুভাষের— কাছে যেমন চমৎকার লাগত, তেমনি প্রীত করত আর একজনকে, যাঁর কথা এবার আমি বলব।

বিরাট পুরুষ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর ভিতর দৌলতপুর কলেজে যাতায়াত শুরু করেছেন। তিনি তখন যশোর-ঝিনাইদা লাইট রেলওয়ে নির্মাণের কাজে ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর সাইকেল চড়ে তিনি সচরাচর আসতেন, আবার ভোর হতেই চলে যেতেন। আমাদের গভর্নমেন্ট বিল্ডিং হোস্টেল নিবাসী তাঁরই এক তরুণ অনুগামী আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যায়; এই বন্ধুটিও তখন আমাদের সঙ্গেই কাজ করত।

আমার সমস্ত অন্তর যেন যতীনদার মধ্যে খুঁজে পেল আমার বহু-বাঞ্ছিত নেতাকে। কিন্তু ক্বচিৎ তাঁর মুখে রাজনীতির বা বিপ্লব সংক্রান্ত পরিকল্পনার কথা শুনেছি। আমার দৈহিক গঠন তাঁর পছন্দ হল, সবে তখন আমি নিজেই উপলব্ধি করেছি যে শরীরটা আমার বেশ মজবুত। গীতার শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপনের কথাও আলোচনা করতেন। দৌলতপুরে আমার কাজকর্ম ও জীবনধারার খবরও রাখতেন তিনি এবং এতে তাঁর সমর্থন ছিল; তাঁর নির্দেশে যে দু-একটি বন্ধুকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছি, তারাও প্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর এই নৈশ আগমন খুব ঘনঘন সম্ভব না হলেও আমাদের মনে-প্রাণে তিনি দিয়ে যেতেন অপূর্ব আনন্দের শিহরণ, আমরা যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম তাদের। শশীদার সঙ্গে তাঁর বহুদিনের পরিচয় এবং তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাও করতেন যতীনদা। শশীদার ঘরের সামনের খোলা বারান্দায় একমাত্র আমারই সৌভাগ্য হয়েছিল যতীনদার সঙ্গে একত্রে রাত কাটানোর---ক-টা মাত্র রাত, কিন্তু অবিস্মরণীয়।

এল ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধ। যতীনদা তাঁর যশোরের ব্যবসার পাট তুলে দিলেন। তার মধ্যে কিন্তু আরও কদিন তিনি দৌলতপুরে এলেন। আমাদের কাছে সম্ভাব্য এক অভ্যুত্থানের বার্তা বয়ে নিয়ে এলেন ইতিমধ্যে যাদুগোপাল মুখার্জি, সতীশ সেনগুপ্ত, আশুতোষ দাস এবং সতীশ চক্রবর্তী। ফলে আমাদের কাজ যেমন ত্বরান্বিত তেমনি উত্তরোত্তর ব্যাপক হয়ে উঠল। যতীনদা তাঁর ব্যবসা তুলে দিয়ে স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যতের ভার ঈশ্বর জানেন কার হাতে সঁপে দিয়ে বিপ্লবীদের পুরোভাগে যেদিন এগিয়ে এলেন, জেলায় জেলায় বিপ্লবের কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাঁর নাম মুখে শোনা যেতে লাগল।

সুভাষ ও হেমন্ত, দু-জনেই আমায় ভালোবাসত। মাঝে মাঝে আমায় ওরা ডাকত কৃষ্ণনগরে; সেখানকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ— বেণীমাধব দাস, হেম সরকার এবং রমেন্দ্র ঘোষ (শৈলেন ঘোষের দাদা), আমাদের কার্যকলাপের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। সে-যুগে বেণীবাবু সুপরিচিত ছিলেন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যেও। কটকে তিনি বসু পরিবারের সবকটি ছেলেরই শিক্ষক ছিলেন, সে-বাড়িতে সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। প্রধানত এই ঋষি-তুল্য ব্যক্তিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার দরুনই হেমন্ত অতগুলো সেরা ছাত্রকে দলে টানতে পেরেছিল। আমাদের প্রায়ই দেখা হত

এবং আমাদের আলোচনা চলত ধর্ম ও রাজনীতি নিয়েই মূলত। সুভাষ সেখানে যেত কলকাতা থেকে, আমি দৌলতপুর থেকে। একবার সুভাষ আমায় ওখানে এসে বললে— সাঁতার শিখিয়ে দিতে। খোড়ে নদীর অগভীর স্বচ্ছ জলে একদিনের চেষ্টাতেই সে মোটামুটি সাঁতার শিখে নিল।

সুভাষের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল হেমন্ত। নতুন নতুন ভাবধারায় গজগজ করত হেমন্তের মাথা। তখন সে প্রচার করতে শুরু করেছে। বিপ্লবীদের নেতৃত্বপদে কারও অধিকার নেই, যদি-না তিনি মুক্তপুরুষ হন।

একদিন সন্ধেবেলা আমরা তিনজনে খোড়ের ধারে বসে। অকস্মাৎ হেমন্ত আমায় জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা যতীন মুখার্জি কি মুক্তপুরুষ?''

আমি একটু চুপ করে রইলাম, একটু হেসে জবাব দিলাম, ''আমি নিজেই তো জানিনে মুক্তপুরুষ কাকে বলে। তবে নিয়মিত গীতা পড়ি। আর নিজের জীবনে কাউকে যদি দেখে থাকি গীতার আদর্শকে মূর্ত করে তুলতে— সে একমাত্র যতীনদাকেই,'' সুভাষ গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি বলে চললাম, ''বিভিন্ন বিপ্লবী দলের যত নেতাকে আমি দেখেছি, তাঁদের মধ্যে একমাত্র যতীনদাই বিপ্লবীদের এত বছরের অন্তহীন পথ হাতড়ানোর প্রয়াস উদ্ভাসিত করে তুলেছেন আলোর বন্যায়। তিনি বলেন যে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম, কানাই ও সত্যেন চরম আত্মদানের পথ দেখিয়েছে, এতদিনে তাই সাড়া জেগেছে দেখো সুপ্ত জাতির ধমনিতে। আমরা এক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা করছি বর্তমানে। যদি সফল হই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা দলে দলে উৎসর্গ করব আমাদের জীবন। পথ বেঁধে দেব এইভাবে। আমরা মরব, জাতি জাগবে, আর স্বাধীনতা আসবে তখনই যখন ধাক্কার পরে ধাক্কা খেয়ে আবর্তের পর আবর্তের সৃষ্টি হবে, আর তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে গোটা জাতির চেতনা। শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতির সংগ্রামের ফলে আসবে স্বাধীনতা।''

আবিষ্ট অভিভূত হয়ে পড়ল সুভাষ; সারা সন্ধে আর একটি মাত্র কথা শুনলাম না তার মুখে। সমসাময়িক আর দশটা সমস্যা নিয়ে হেমন্ত নানা আলোচনা চালাতে লাগল।[১]

কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে আমি এরপর এসে ভরতি হলাম থার্ড ইয়ারে। কিন্তু অনার্স ক্লাসগুলোর জন্যে আমায় যেতে হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে, ফিলজফি ক্লাসে সুভাষ আমার সহপাঠী। দর্শনে সুভাষের অত্যন্ত গভীর অনুরাগ। আমাদের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক পাতার পর পাতা মার্তিলোর 'Natural Theology'র মত দুরূহ গ্রন্থ পড়ে চলছিলেন।

ক্লাসে আমাদের ক্ষোভের অন্ত নেই। সুভাষ শুরু করল দিনের পর দিন অজস্র প্রশ্ন করতে। অধ্যাপক বিরক্ত হলেও অবশেষে নিজেও প্রস্তুত হয়ে আসতেন। ফলস্বরূপ ক্লাসটা তাঁর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল কতকটা। প্রতিটি পরীক্ষাতেই সুভাষ প্রথম হতে লাগল, আমি দ্বিতীয়। আমাদের দুজনের আলোচনা রাজনীতির বেড়া ডিঙিয়ে দর্শনের প্রান্তরে এসে পড়ল। তার সঙ্গে কলেজে, তার এলগিন রোডের বাড়িতে এবং সবচেয়ে বেশি হিন্দু হোস্টেলে আমার দেখা হত এবং শেষের জায়গাটিতেই চলত আমাদের রাজনীতির চর্চা।

ওদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ব্যাপক এবং প্রবল হয়ে উঠল। আমরাও তাতে অংশ নিলাম। যতীনদা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। চারধার থেকে পুলিশ তৎপর হল তাঁকে ধরতে।

সুরেশদার দলের মধ্যে অন্যরকম পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। হেমেনদার কণ্ঠে বর্দ্ধমান অসন্তোষ : ''কীসের অন্বেষণ করছি— আমরা?'' সুরেশদার মুখে শুধু মাত্র অনির্দিষ্ট নেতিবাচক কয়েকটা আদর্শের কথা। যেমন ডাকাতি কোরো না, বিয়ে কোরো না। —কিন্তু করবোটা কী? অরবিন্দ মুখুজ্যের মুখে প্রকাশ্য বিপ্লবেরই প্রচার শোনা যাচ্ছে। বিধুর মুখেও। ১৯১৪ সালে উড়িষ্যার দশপালা রাজ্যের খোন্ড বিদ্রোহের পলাতক নেতা গোবিন্দ মিশ্র এবং আমাদের শশাঙ্ক— দুজনেই ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যোগেনদা এবং নৃপেন একটা অঘটনের গন্ধ পেয়ে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন ত্রাসের চোখে। কিন্তু যোগেনদার সন্দেহ গভীরতর ছিল হেমন্তের প্রতি এবং ফলস্বরূপ সুভাষের বিদ্রোহের বয়ও তাঁর মনে ছিল।

সুরেশদা কয়েক মাস কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করে ফিরে এলেন। একদিন সন্ধেবেলায় তিনি তাঁর তিন নম্বর মীর্জাপুর স্ট্রিটের মেসে নিজেদের লোক অনেককে ডেকে বেদান্তের ওপর বক্তৃতা দিলেন। শেষ যখন হল তখন বেশ রাত হয়েছে। সুভাষ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইল ''সুরেশদা, বৈরাগ্য-শতকের একটা কপি কোথায় পেতে পারি?'' উনি জবাব দিলেন, ''গুরুদাসের দোকানে দেখো।'' অমনি মেসের একজনের কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে, তার সেই আটপৌরে শার্ট আর চটি পরে সুভাষ ছুটল কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। পরে শুনলাম, সেখান থেকে সারাটা পথ সে হেঁটে এলগিন রোডের বাড়িতে ফেরে, সারারাত জেগে বইটা পড়ে শেষ করে সকালের দিকে ঘুমিয়ে নেয় একটু।

সুরেশদা ফিরে আসাতে তাঁর দলের অভ্যন্তরীণ অবস্থা একটু ভালোর দিকে গেল। যোগেনদার কিন্তু আর তর সইছিল না। সংগঠনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুরেশদার ডান-হাত। একটা কিছু করে ফেলার জন্য তিনি তখন মরিয়া। হেমন্তের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। ষড়যন্ত্রকারীদের পালের গোদা বলে অভিহিত করলেন তাকে। একদিন তাঁদের ২/১১ ওয়েলিংটন স্ট্রিটের মেসে যেতেই ঘটল নাটকীয় এক ব্যাপার। এই মেসটি আমাদের দৌলতপুরের খেজুরবাগান মেসের অনুকরণে গড়ে তুলেছিলেন ওঁরা। এটা উঠে যায় ৫৮, মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে। একটা প্রতিনিধি স্থানীয় দল আমার কাছে এসে দাঁড়াল। ছিল বিধু, সুভাষ, হেমন্ত, গোবিন্দ মিশ্র এবং আরও-কজনও। অরবিন্দ মুখুজ্যে তাদের হয়ে মুখ খুলল। বলল, ''ভূপেন, তোমায় বলা দরকার যে এখন থেকে আমরা আর সুরেশদার দলের নই, আমরা তোমার সঙ্গে একই দলে একযোগে কাজ করতে চাই, একই আদর্শ নিয়ে।''

—এর কিছু আগেই হেমেনদা ওঁদের মেস

ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং ফরিদপুরের ইন্দু সরকারের সঙ্গে, বৈঠকখানায় নতুন মেস খুলেছেন।

কিন্তু গোবিন্দ মিশ্র, হেমেনদা এবং শশাঙ্ক ছাড়া, এরা কেউই আসন্ন বিপ্লব অভ্যুত্থানের আয়োজনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবার আগেই ঘটে গেল ওটেন পর্ব। কয়েক মাস পরের কথা। আমি তখন জশিডিতে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই সহকর্মী কুন্তল চক্রবর্তী ও চারু ঘোষের সেবা-শুশ্রূষা করছি, তারা যক্ষ্মায় ভুগছে। অরবিন্দ খবর পাঠাল : ''সুভাষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।''

হেমন্তের বইয়ের দোকান ইন্ডিয়ান বুক ক্লাবে আমাদের দেখা হল। সামান্য কিছু কথাবার্তার পর সুভাষ আসল প্রসঙ্গ পাড়ল : বোম্বাই পৌঁছেই সে দু-দিন গান্ধীজীর কাছে কাটায়; তারপর কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হয়। দেশবন্ধুই দ্বিতীয় সর্বভারতীয় নেতা, তার মতে; কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় জনের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর। তারপর সে অন্যদের সঙ্গেও আলাপ করেছে। ''কিন্তু চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে,'' সুভাষ বলল, ''আমার মনে হল তোমার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার তাই খবর পাঠিয়েছিলাম। আমি কংগ্রেসে ঢুকতে এবং তার কাজ করতে চাই।''

''আমিও তো গান্ধীজীকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়ে এসেছি নাগপুরে।''

''না, আমি একটু প্রভেদ রাখছি। দলে আমি এখনই যোগ দিচ্ছি না।''

''কিন্তু দলই তো নেই এখন। আমরা তো দলের কথা না ভেবে এখন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছি।''

''ভালোই হল তবে।''

ক-দিন বাদে মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত) আমায় বললেন মধুদার (সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের) সঙ্গে সুভাষের আলাপ করিয়ে দিতে। এদেশে সেদিন মধুদার মতো প্রভাবশালী কংগ্রেস কর্মী (সত্যিকার অর্থে কর্মী) ছিল বিরল। দু-জনেই দু-জনকে পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তাঁদের অন্তরঙ্গতা কিন্তু ঘনীভূত হল উত্তর বাংলার বন্যার এবং ১৯২৪ সালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের ব্যাপারে। ---তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময় আমরা দ্বিতীয় বার জেলে। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা যখন বিভিন্ন জেলায় স্বরাজ্য দল সংগঠিত করছি, সেই সময় আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আমাদের গ্রেপ্তারের পর স্বরাজ্য দল গঠনের সর্বৈব দায়িত্ব সুভাষের উপর ন্যস্ত থাকাতে সে মধুদা, হরিদা এবং অমর ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রত্যেক জেলার কর্মীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। কিন্তু তার কিছু কাল আগে, সুভাষ তখনও জেলে, দেশবন্ধুও, ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের একটা বৈঠক বসে।[২] আমি ছিলাম আহ্বায়ক। গান্ধীজীর প্রতিশ্রুত একটা বছর তার ঢের আগেই উতরে গিয়েছে। চৌরিচৌরার ঘটনাও ঘটেছে। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল। তখন যুগান্তর দলকে পুনঃসংগঠিত করবার সঙ্কল্প নিলাম আমরা। স্থির করা হল যে অস্ত্র আবার সংগ্রহ করতে হবে কিন্তু ব্যবহার করা হবে না এখনও।

কিন্তু দলের সত্যিকার পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় ১৯২৪ সালে, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সুযোগ নিয়ে; এই সত্যাগ্রহে নায়কের ভূমিকায় সুভাষও ছিল। এই হল হেতু যার জন্যে সুভাষকে অল্প দিন বাদেই গ্রেপ্তার করে শুরুতে প্রথম বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুযায়ী তারপর ১৮১৮ সালে তিন আইনে।

সুভাষ মুক্তি পাবার কিছু পরেই দল থেকে তাকে মনোনীত করা হল—কলকাতায় ১৯২৮ সালের আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর G.O.C. পদে। অভ্যর্থনা সমিতিও তাঁকেই নির্বাচিত করে ওই পদে। তেমনি মনোরঞ্জন গুপ্তকে দেওয়া হলো প্রদর্শনীর ভার, আর ভূপতি মজুমদারকে মূল কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ইউথ কংগ্রেসের ভার। দলের অন্যান্য দিকেরও দায়িত্ব নিলেন। স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সাধারণ দায়িত্ব ছিল আমার। এই সংগঠনের সাহায্যে আমাদের দল চেয়েছিল দেশব্যাপী একটা স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের সুচনা করতে। সুভাষের ব্যক্তিত্ব এই কাজের অনুকূল হয়েছিল অপরিমেয়রূপে; কিন্তু অপ্রত্যাশিত বলব না তাকে। সেই থেকে সুভাষ এবং তার দাদা শরৎ বোস যুগান্তর দলের পরবর্তী কার্যক্রম সফল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন— যে কার্যক্রমের বহিঃপ্রকাশ প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯৩০ সালের চমকপ্রদ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপারে এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে।

কিন্তু এসব প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধের আওতার বাহিরে।[৩]

পাদটীকা :

১। 'বিপ্লবে বিদ্রোহ' নিবন্ধে লেখক বলেছেন, ''প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে যতীন্দ্রনাথ যখন জার্মানির সাহায্য নিয়ে স্থানে স্থানে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন সুভাষচন্দ্র যুগান্তর দলে সবে যোগ দিয়েছেন এবং পরোক্ষভাবে যতীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এবারে যুদ্ধ লাগবার সকল আয়োজন তিনি ইউরোপে থাকতেই দেখেন এবং এই পন্থাতেই অগ্রসর হবার সংকল্প করেন।...''

ডাঃ যাদুগোপাল লিখেছেন, ''প্রায় ২৬ বৎসর পূর্বে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিদেশি শক্তির (জার্মানির) সাহায্যে যেভাবে দেশ স্বাধীন করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন ১৯৪১ সালে সুভাষবাবুও তাকে হুবহু অনুসরণ করলেন।...(পৃ. ৬০৪) —অনুবাদক।।

২। উপস্থিত ছিলেন অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন রায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ডাঃ আশুতোষ দাস, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন গুপ্ত, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, সূর্য সেন এবং লেখক। অসহযোগ আন্দোলনে এঁরা সবাই নেমেছিলেন।—অনুবাদক।

৩। ১০৬৪ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত Netaji Exhibition এর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত Netaji Sourvenir সংখ্যার ''In College Days'' অনুবাদক : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—বাংলায় প্রথম প্রকাশ : 'জয়ত্রী', পৌষ ১৩৭১।

(লেখক বাঘা যতীনের সমসাময়িক বিপ্লবী)

ইতিহাসপুরুষ কৃষ্ণ
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে

দেবব্রত ঘোষ

কৃষ্ণ আদপেই ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা এই বিতর্ক ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই চলছে। ভারতীয় পুরাণবিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরশুরাম চতুর্বেদী, গোবিন্দাচার্য্য স্বামী এবং বিশেষ করে মারাঠী ইতিহাসবিদ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের মতবাদে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তাঁরা শুধু যে ভারতীয় ভক্তিবাদে বাইবেলের প্রভাব ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনের যাবতীয় ঘটনা বা উপাখ্যানের মধ্যে যীশুখৃষ্টের ছায়াই লক্ষ্য করেছেন তাই নয়, বিভিন্ন উপনিষদ, অন্যান্য প্রামাণিক পুরাণ ও বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে কিংবা অপব্যাখ্যা করে একাধিক কৃষ্ণকে আবিষ্কার করে বসেছেন।

বিশ্বের ইতিহাসে কৃষ্ণই প্রথম ব্যক্তি যিনি একজন স্ত্রীলোককে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তৎকালীন কাশ্মীরের রাজা গোনন্দ জরাসন্ধের প্ররোচনায় পা দিয়ে যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বলরামের হাতে নিহত হন। তখন কৃষ্ণ গোনন্দের পুত্র দামোদরকে কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে বসান, আরো পরে গান্ধার রাজ্যের এক স্বয়ংবর সভায় আমন্ত্রিত যাদবদের দামোদর এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অকারণে আক্রমণ করেন। তখন কৃষ্ণের হাতে দামোদরের মৃত্যু হয়। দামোদরের বিধবা পত্নী যশোবতীকে (তখন যশোবতী অন্তঃসত্ত্বা) কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। কৃষ্ণ কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীর দখল করে নেননি। চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের হাতে মৃত্যুবরণ করার পর কৃষ্ণ শিশুপালের ছেলে ধৃষ্টকেতুকেই চেদি রাজ্যের সিংহাসনে বসান, জরাসন্ধ বধের পরে মগধ দখল না করে জরাসন্ধের ছেলে সহদেবকেই মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। নিরাসক্ত ও নিয়ন্ত্রিত ক্ষাত্রশক্তির জন্যই কৃষ্ণ পুরুষোত্তম। কৃষ্ণের এই আদর্শ ক্ষত্রিয়জনোচিত কর্ম, দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের রাজধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর জীবনের এই দিকটা কিন্তু পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ঐতিহাসিক ও গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে স্বেচ্ছাকৃতভাবেই।

জার্মান ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হ্যারমান জ্যাকবি, অ্যালবার্ট ওয়েবার, লরিনসার, মার্কিন পণ্ডিত ই হপকিন্স, ডব্লিউ কেনেডি, এন ম্যাকনিকল, জে এন ফারকুহার, ফরাসি পণ্ডিত ইউজিন বুর্নফ ছাড়াও উইলিয়াম জোনস্, পি জর্জি প্রমুখ বিশিষ্ট একদেশদর্শী পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁদের গবেষণা গ্রন্থে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন মহাভারতের কৃষ্ণ এবং ভাগবতের ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র ও আলাদা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করতে। খানিকটা ব্যতিক্রম শুধু এ বি কথ। ওয়েবারের গবেষণা গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের নাম History of Indian Literature, এই বইতে এবং Indian Antiquary নামক সমকালীন সাময়িক পত্রিকায় An investigation into the origin of the Festival of Krishna Janmastami নামাঙ্কিত প্রবন্ধে ওয়েবার রামায়ণকে ইলিয়াডের রূপান্তর বলে

প্রতিপন্ন করেছেন এবং শুধু তাই নয়, ভারতে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অনেক কাহিনি ও বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিমূলক মতবাদকে খৃষ্টীয় পরিকল্পনা ও যীশুখৃষ্টের জীবনকাহিনি থেকে সংকলিত ও সংগৃহীত বলেও প্রচার করেছেন।

ওয়েবার এতটাই একদেশদর্শী যে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই ভারতীয় গ্রন্থ, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য ও ধর্ম সম্পর্কে চটুল মন্তব্য করেছেন এবং এই পদ্ধতিতেই ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখিত দেবকীনন্দন কৃষ্ণ প্রসঙ্গে লিখলেন, ''Krishna worship proper, that is the secterian worship of Krishna as the one God probably attained its perfection through the influence of Christianity.'' বৃন্দাবনের যশোদাদুলাল কৃষ্ণ বা দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, ও মহাভারতের কৃষ্ণ যে আলাদা মানুষ এই তত্ত্ব প্রচার করলেন। Religions of India গ্রন্থে হপকিন্সও একই মতবাদ প্রকাশ করলেন। আরো পরে ডব্লিউ কেনেডি লন্ডন থেকে প্রকাশিত রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ওয়েবারের সমর্থনে বিশাল প্রবন্ধ লিখে বসলেন। আসলে, ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন বিবদমান দেশ ও রাষ্ট্র পারস্পরিক বিভেদ আপাতত শিকেয় তুলে রেখে পাশ্চাত্য শ্বেতজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগলেন; জাত্যভিমান এমনই হয়!

কোনো দেশের, বিশেষ ভাবে রাজনৈতিক ভাবে পরাধীন দেশের জনমানসকে বিভ্রান্ত করতে হলে সেই দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আক্রমণ করাই সহজতম পন্থা— এই সত্যটা ইউরোপীয় খৃষ্টীয় পণ্ডিতদের জানা ছিল। এই ফাঁদে পা দিয়েছিলেন আমাদের দেশেরই অনেক পাশ্চাত্য খেতাবলোভী স্ব-ঘোষিত বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিক যাঁদের অন্যতম ছিলেন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর যিনি জার্মানি থেকে প্রকাশিত Vaisnavism, Saivism and Minor Religions Systems নামক গ্রন্থে এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে পড়ে লাগলেন। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরই প্রথম ভারতীয় ঐতিহাসিক যিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন শিশু কৃষ্ণ (গোপাল) সম্পর্কিত কাহিনিগুলো আভীর বা আহির নামে পরিচিত একশ্রেণীর গোচারণ-বৃত্তিধারী উপজাতীয় মানুষদের সমাজ ও কাহিনি থেকে আহরিত হয়েছিল। এই আভীর বা আহির শ্রেণীর মানুষেরাই নাকি খৃষ্ট নামখানিও বহন করে এনেছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী বৃন্দাবনের গোপিনীদের শারীরিক বর্ণনাও নাকি আভীর কুলকন্যাদের অঙ্গবৈশিষ্টের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কৃষ্ণ ও গোপিনীদের লীলাবিলাসের মধ্যেও আভীর রমণীদের শিথিল মানসিকতা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালেও ভাণ্ডারকর একই মতবাদ প্রচার করলেন। ''the dalliance of Krishna with cowherdesses which introduced an element inconsistent with the advance of morality into the Vasudeva religion was also an after-growth, consequent after the freer intercourse between the wandering Abhiras and their more civilized Aryan neighbours.'' ভাণ্ডারকর গোকুলে নন্দ রাজার আশ্রয়ে মাতা যশোদার আদরে বেড়ে ওঠা কৃষ্ণের কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করেন না। তিনি তাঁর ধারণায় অবিচল যে সিরিয়া কিংবা এশিয়া মাইনর থেকে আগত আভীর জাতির মানুষেরা যীশুর উপাখ্যান বয়ে এনেছিল যেগুলো পরবর্তী সময়ে রূপান্তরিত হয়েছে গোপাল কৃষ্ণের নামে। তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই মতের ইঙ্গিতটাকে সমাদরে স্বাগত জানাতে কালক্ষেপ করেননি। **ভাণ্ডারকর নাইট উপাধি পেয়ে গেলেন।**

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, ''তদ্বৈতদ ঘোষ আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উকতবা উবাচ অপিপাস এস স বভুব-সোন্ত বেলায়াম এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষতম অসি, আচততম অসি, প্রাণ সংশতিততমসীতি।'' এই শ্লোকের মধ্যে কৃষ্ণ যে আঙ্গিরা গোত্রীয় ঘোর নামক ঋষির শিষ্য তার কোনো উল্লেখ নেই। কৃষ্ণ আসলে সান্দীপনী মুনির শিষ্য এবং তাঁর পড়াশুনো সমাপ্ত হয়েছে উজ্জয়িনীর আশ্রমে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বাসুদেব শব্দটির উল্লেখ রয়েছে নারায়ণ ও বিষ্ণুর সমান কক্ষায়। বাসুদেব মানে বসুদেবের ছেলে। এখানেই আপত্তি তুলেন জার্মান পণ্ডিত জ্যাকবি। তাঁর মতে বৈদিক যুগ যখন প্রায় শেষ হয়ে এলো তখন বসুদেবের ছেলে কৃষ্ণ অবশ্যই নারায়ণ ও বিষ্ণুর সমকক্ষায় পূজিত হতেন। কিন্তু দেবকীর ছেলে কৃষ্ণ যেহেতু ছান্দোগ্য উপনিষদে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হিসেবে পরিচিত তাই তিনি পুজো পেতে শুরু করেন অনেক পর থেকে। যার মানে দাঁড়াচ্ছে দেবকীর ছেলে কৃষ্ণের বিষ্ণু হিসেবে পূজিত হোতে যতো সময় লেগেছে, বসুদেবের ছেলে কৃষ্ণের ছেলের সময় লেগেছে তার চেয়ে বেশি। পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর মধ্যে বয়সের এই শতাব্দীর ব্যবধান যে ধোপে টেকে না সে সহজ সত্যটা কোনো পণ্ডিতই বুঝলেন না।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে একবার মাত্র কৃষ্ণ নামটি উচ্চারিত হওয়াতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের ধারণা হয়েছে (সঙ্গে সঙ্গে তাদের একান্ত গুণগ্রাহী ভারতীয় পণ্ডিত মহলের একাংশের) পিতা বসুদেবের নামে পরিচিত ছেলেটির এবং মাতা দেবকীর নামে পরিচিত ছেলেটি ভিন্ন ব্যক্তি এবং অবশ্যই ভিন্ন শতাব্দীর। এই সহজ সত্যটা অতি বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মাথায় ঢুকলো না যে একই ব্যক্তি কখনো মায়ের নামে কখনো বাপের নামে পরিচিত হতে পারেন এবং তাতে কোনো অসুবিধে নেই।

জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে (১৯১৫) এ বি কিথ কিন্তু লিখলেন ''The seperation of Vasudeva and Krishna as two different entities, it is impossible to justify.'' ভাণ্ডারকরের আত্মঘাতী থিওরির যদি কেউ সার্থক প্রতিবাদ করে থাকেন তিনি কিন্তু কিথ সাহেবই। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী আবার তাঁর Materials for the Study of Early History of the Vaisnab Sect বইতে শ্লোক ধরে প্রমাণ করেছেন যে দুই কৃষ্ণ আদপে একই ব্যক্তি। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নরেন্দ্রনাথ

লাহা বলেছেন যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির বহিরঙ্গ বিচারেই তৎপরতা দেখিয়েছেন কিন্তু কখনোই অন্তরঙ্গ বা গভীরতায় প্রবেশ করতে পারেননি (studies in Indian history and Culture-1925)। যেখানে অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিত ইউরোপীয় ভাবধারার অনুকরণে ও অনুসরণে পাশ্চাত্যের মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন এবং তাদের সিদ্ধান্তকেই প্রামাণিক বলে মেনে নিয়েছেন সেখানে নরেন্দ্রনাথ লাহা, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, কাশীরাম ত্র্যম্বক তেলাং, রমাপ্রসাদ চন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যারা সত্যের খাতিরে আপোশ করেননি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখিত কৃষ্ণ, গোকুলে নন্দরাজার গৃহে পালিত (গোপাল) কৃষ্ণ ও মহাভারতের পার্থসারথি-কৃষ্ণ একই ব্যক্তি। ব্যাসদেব বা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা যেমন বৈশম্পায়ন, পৈল, জৈমিনি, সুমন্ত শুক, উগ্রশ্রবা সৌতি কেউই দ্বারকা-মহাভারতের পার্থসারথি- কষ্ণ এবং গোকুল-বৃন্দাবনের গোপাল-কৃষ্ণকে আলাদা আলাদা মানুষ বলে উল্লেখ করেননি। পানিনি কিন্তু ৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মানুষ। তিনি কিংবা তার ৩০০ বছর পরবর্তী পতঞ্জলি (২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের)। এই দুজনের কেউই বৃন্দাবনের গোপাল-কৃষ্ণ এবং মহাভারতের (বা দ্বারকার) পার্থসারথি কৃষ্ণকে আলাদা মানুষ বলে উল্লেখ করেননি।

মহাভারতে কৃষ্ণের বাল্যজীবনের উল্লেখ নেই বলে তাঁর বাল্যজীবন বলে কিছু ছিল না এই থিয়োরি ধোপে টেকে না। মহাভারতের ঠিক পরবর্তী হরিবংশে ও ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের শৈশব, বাল্য ও কিশোর বয়সের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ভাগবত পুরাণের কথক কিন্তু একই ব্যাসদেব যিনি মহাভারত সংকলনের কিছুকাল পরেই ভাগবত পুরাণ রচনা শুরু করেছিলেন। ভাগবত পুরাণের পরবর্তীকালে কিছু কিছু শ্লোক বা ঘটনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু কৃষ্ণের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর সময়ের কাহিনি অবিকৃত অবস্থায় ছিল। ব্যাসপুত্র শুকদেব পরীক্ষিতের মৃত্যুর আগে কৃষ্ণের জীবনের অনেক কাহিনি বিবৃত করেছেন যার মধ্যে শৈশব, বাল্য ও কিশোর সময়ের কাহিনিও ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের ধাক্কা সামলাতে পারেননি ভারতের সমকালীন খৃষ্টান পাদ্রীরা এবং দেশীয় কিছু মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় বিবেকানন্দের বিরোধিতা শুধু নয় তাঁর চরিত্রহরনও করে গিয়েছিল মিশনারীরা। আর জি ভাণ্ডারকর যখন কৃষ্ণ নিন্দায় বা মহাভারতের অপব্যাখ্যা রচনায় লিপ্ত তখন বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন না বলে ভাণ্ডারকরের কিছু সুবিধে হয়ে গিয়েছিল হিন্দু-পুরাণ কাহিনিকে বিকৃত করে একাধিক কৃষ্ণকে আবিষ্কার করতে।

সনাতন ধর্মে চাররকম বিদ্যের কথা বলা হয়েছে— বেদ, আন্বীক্ষিকী (যুক্তি-তর্ক-দর্শন), বার্তা (অর্থনীতি) ও দণ্ডনীতি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)। বেদ শব্দের মধ্যে চিকিৎসা (আয়ুর্বেদশাস্ত্র)-সহ বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত। দর্শনের মধ্যে ভারতীয় ষড়্দর্শনের সবগুলোই রয়েছে, অর্থনীতির মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহ সহ দেশ ও সমাজ উন্নয়ন-পরিকল্পনা রয়েছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ইতিহাস, কূটনীতি, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সবই অন্তর্ভুক্ত। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি বিষয়ে অন্তিম উপদেশ দেবার সময় ভীষ্ম বলছেন কৃষ্ণই সামগ্রিক বিদ্যেয় সম্যক পারদর্শী যে বিদ্যে তিনি উজ্জয়িনীতে সান্দীপনী মুনির কাছে শিক্ষার সময়েই আয়ত্ত করেছিলেন।

কৃষ্ণ ধর্মের এক ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। সভ্যতা একটি বিশিষ্ট জীবনধারা, মানবাত্মার এক অভিযান। কোনো জাতির জৈবিক একতা বা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তার সারমর্ম পাওয়া যাবে না, যে সব মূল্যবোধ তাদের সৃষ্টি করে ও রক্ষা করে তাদের মধ্যেই সভ্যতার মর্ম নিহিত। প্রত্যেক সভ্যতা একটা ধর্মের বহিঃপ্রকাশ কেননা ধর্ম মানেই পরম মূল্যে বিশ্বাস এবং তা লাভ করার জন্য জীবনচারণা। যা সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে তাই ধর্ম। মহাভারতেই বলা হচ্ছে ধর্মের দ্বারাই সকল জীবের বৃদ্ধি ও অভ্যুদয় হয়— *ধর্মে বর্ধতি বর্ধন্তি সর্বভূতানি সর্বদা* **(শান্তিপর্ব—মহাভারত)**।

ধর্ম সমস্ত লোকস্থিতিকে ধারণ করে রাখে (*ধর্ম ধারয়তি প্রজাঃ* **উদ্যোগপর্ব—মহাভারত)**। এই মহাভারতেই বলা হয়েছে *ধর্মে তিষ্ঠতি ভূতানি* **(শান্তিপর্ব—মহাভারত)**। আবার যা থেকে জীবনে সকল ধনের প্রাপ্তি ঘটে সেটাও ধর্ম (*ধনাৎ স্রবতি ধর্মোঃ* **শান্তি পর্ব---মহাভারত)**। ধর্ম হলো সেই মহাশক্তি যা সমস্ত জগৎ ও জীবনকে ধারণ করে রয়েছে। আবার যাকে অবলম্বন করে আমরা প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা, পঙ্কিলতা, গ্লানি ও আত্মস্বার্থের ওপরে মহান উদার নিঃস্বার্থ ভালবাসাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি সেটাও ধর্ম। ধর্ম বলতে ফুল-বেলপাতা-তুলসীপাতা-ফল-নৈবেদ্য-মন্ত্রোচ্চারণ বোঝায় না, মন্দির-মসজিদ-গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনাকেও বোঝায় না। কৃষ্ণের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত সত্যের ওপর (*সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম*---**শান্তিপর্ব---মহাভারত)**। ভাবনায় উদারতা, কর্মে নিষ্কামতা, ভক্তিতে শরণাগতি, জ্ঞানে সর্বভূতে ব্রহ্মভাব, ধ্যানে চিত্তসংযোগ, নীতিতে সাম্যবুদ্ধি, উপাসনায় জীবসেবা, সাধনায় ত্যাগের অনুশীলন, জীবনযাপনে স্বধর্মপালন এই হলো ধর্মের মূল কথা। দয়া শব্দের অর্থ হলো সকলের সুখের জন্য চেষ্টা করা, দান শব্দের অর্থ হলো যা সকলকে রক্ষা করে, ধৈর্য শব্দের মানে হলো নিজের ধর্মে স্থিত থাকা।

কৃষ্ণের ভগবদ্রূপ কিন্তু ভীষ্মের মুখেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল (নমো ব্রহ্মাণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ্যহিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ)। সমকালীন বিখ্যাত ঋষি মৈত্রেয় ও কন্ব (ইনি কিন্তু শকুন্তলার পালক পিতা কন্ব মুনি নন) এবং ব্যাসদেবের কাছেও কৃষ্ণ ভগবদ্স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতের যুদ্ধের সময়কাল কিন্তু কম করেও ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে, কাজেই কৃষ্ণের ভগবদ্সত্ত্বা যীশুখৃষ্টের জন্মের দেড়হাজার বছর আগে প্রচলিত ছিল।

(শুভ কৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রকাশিত)

না না, বিহারের নির্বাচন কখনই প্রধানমন্ত্রী মোদীর ওপর গণভোট নয়

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

আমাদের গণমাধ্যমগুলির মধ্যে যে ভোট পণ্ডিতদের অংশ বিশেষ নজরে পড়ে তাদের দৃষ্টিকোণ অনেকটাই আমেরিকার তথাকথিত উদারবাদী ম্যানহাটান বা বহুবিধ আমেরিকান আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় লালিত। তাদের কাছে একটা উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। যদি বেশ কয়েকটা নগর পালিকায় নির্বাচনী ফলাফলকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আনুপাতিক বা নানান ভোট বিচার মানদণ্ডে ফেলে তা কি ফলাফল প্রসব করছে এমনটা অনুমানের চেষ্টা করা হয়, সেক্ষেত্রে এমন সব প্রচেষ্টা কিন্তু সম্পূর্ণ উপহাস বা অবজ্ঞার বিষয় হয়ে উঠবে। কারণটা খুবই সহজ— রাজনীতির ওপর থেকে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর স্তর থেকে মই বেয়ে যত নিচের দিকে অর্থাৎ পঞ্চায়েত ক্ষেত্র অবধি নামতে থাকে ততই তার মধ্যে ভঙ্গুরতা দেখা দেয়। আর সে কারণেই প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্রে কোনো সহজ সমীকরণে পৌঁছানো আদৌ নিরাপদ নয়।

বিষয়টি আমেরিকার ক্ষেত্রেও যেমন সত্যি ভারতের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। দেশের লোকসভা কেন্দ্রগুলি বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে ছড়ানো। সেখানে স্থানীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলি কখনই নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে না। এই সব কেন্দ্রগুলিতে সাংগঠনিক দুর্বলতা কোনো কোনো কেন্দ্রে থাকলেও জাতীয় দলগুলি সব সময়ই সামগ্রিকভাবে একটা বাড়তি সুবিধে পেয়ে থাকে। এখন দিনকে দিন লোকসভা এমনকী বিধানসভা নির্বাচনগুলিও ক্রমশ চরিত্রগতভাবে খানিকটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের চেহারা নিচ্ছে। তার কারণ নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলির আয়তন অনেকক্ষেত্রেই বিশাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সদ্য সদ্য খাস কলকাতাতেই চার-পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে ২টিতে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত বা নগর নিগমগুলির নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো দেশব্যাপী ক্যারিশমাকে সামনে রেখে নির্বাচন সাধারণত হয় না। তাই এই নির্বাচনগুলিতে বেশি বেশি সংখ্যায় নির্দল প্রার্থীদের লড়তে ও তুলনামূলকভাবে সফল হতেও দেখা যায়।

এই নিতান্ত প্রাথমিক বিশ্লেষণটি করার অনর্থক প্রয়োজন পড়ল। গত সপ্তাহে রাজস্থানের পৌর নির্বাচনের ফলাফলকে ভিত্তি করে কিছু সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল মনে করল এই ফলাফলের ভিত্তিতে বিজেপি'র পতন সূচিত হয়ে গেল। কেননা চুলচেরা বিচারে হয়ত কোনো কোনো এলাকায় ২০১৪ সালের লোকসভার তুলনায় বিজেপি'র ভোট কমে থাকতে পারে। এই সব গবেষণার উদ্দেশ্য একটাই— বিজেপি'র বিদায় আসন্ন প্রতিপন্ন করা। কংগ্রেসের গুরুত্ব ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্যই গান্ধী পরিবারের দলের পক্ষে এমনটা আশা করা বা সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হতেই পারে।

কিন্তু ভোটের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত ভ্রান্ত পদ্ধতি। বাস্তবে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের ফলাফল সার্বিক বিচারে বিজেপি'র প্রাধান্য যে অটুট রয়েছে তাই প্রমাণ করে। কিন্তু আরও নিশ্চিত করে বলতে হলে এটাই বলা দরকার যে ক্রমাগত হৈ-হট্টগোল করে লোকসভা-রাজ্যসভার কাজকর্ম বানচাল করে, নানান ইস্যু নিয়ে বিষোদগার করার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ভোটদাতারা তাদের নির্বাচনী সাফল্য এনে দেবেন এই ভাবনাটা জন্মসূত্রেই যে মৃত ছিল তা কংগ্রেস দল ও কিছু পণ্ডিত মিডিয়া বুঝতে সম্পূর্ণ ভুল করেছিলেন। লোকসভায় কংগ্রেসের লম্ফঝম্ফের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গঞ্জে শহরে ভোটাররা তাদের ভোট দিয়ে জেতাবে এ আশায় সারবত্তা ছিল না।

ফলাফল থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তৃণমূল স্তরে বিজেপি অনেক বেশি সংগঠিত ছিল। সকলেই জানেন যখন কোনো বিরাট রাজনৈতিক ঝড় বয়ে যায় তখন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সেরকম উপলব্ধি হয় না (জরুরি অবস্থার পরের নির্বাচন, বোফর্স কেলেঙ্কারির পরবর্তী নির্বাচন)। সংগঠন তখনই বিশেষ দরকার হয়, যখন কোনো বিরাট উথালপাথাল করার বিষয় থাকে না যা স্থানীয় সমস্যাগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের নির্বাচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে প্রচার মাধ্যমগুলি যে বিষয়গুলিকে অসীম গুরুত্বের বলে মনে করে লাগাতার ঢাক পেটায় দেশের স্থানীয় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে সেগুলি আদৌ গুরুত্বের নয়।

সেই কারণে প্রচারমাধ্যমের সেই পণ্ডিতকূল যারা ইতিমধ্যেই নরেন্দ্র মোদীর শোকগাথা লেখা শুরু করেছিলেন তারা নিজেদের কিছুটা ভবিষ্যৎ সংশোধনের পথ খোলা রাখবে, এমনটা আশা করা যায়। দেশের সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর এই মিডিয়া-পিতৃত্বের ঝড়কে অবলীলায় উপেক্ষা করার যে ক্ষমতা রয়েছে তা আবার একটি সাম্প্রতিক ভোট সমীক্ষা থেকে আন্দাজ করা গেছে। 'ইন্ডিয়া টু ডে— সিসেরো স্টেট অব দি নেশন পোল' নামের বিখ্যাত একটি ভোট সমীক্ষক সংস্থা সম্প্রতি প্রকাশিত তাদের সমীক্ষায় বলেছে— আজকে নির্বাচন হলে এনডিএ আবার ক্ষমতায় আসবে। জনতার ভাবনায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। মোদীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নিয়ে লোকসভায় কটাক্ষ ও প্রচার মাধ্যমে ধুন্ধুমার বাঁধানো ঝড়ের কোনো প্রভাব আদৌ পড়বে না। আশ্চর্যজনকভাবে এই সমীক্ষার ফলাফল আদৌ কোনো বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেলে

কিছুতেই তেমন প্রচার পায়নি।

নিশ্চিতভাবেই মেয়াদপূর্তির মধ্যবর্তী সময়ে যে কোনো নির্বাচনই কিছুটা ইঙ্গিতবাহী হতে পারে। ভোট প্রচার শেষাবধি ভোটদাতাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা নেয়। সকলেই দেখেছেন গোড়ার দিকে সুবিধেজনক অবস্থায় থাকলেও দিল্লীতে শেষের দিকে এএপি দলের তীব্র প্রচার ও সংখ্যালঘুদের কৌশলগত ভোটদানের ফলে বিজেপি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তাই এই পরিস্থিতিতে বিজেপি যদি এই পৌর নিগমগুলির সাফল্যের ভিত্তিতে আসন্ন বিহার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো আনুপাতিক বা সম্ভবনাভিত্তিক ফলাফল করার কোনো আন্দাজ লাগাবার চেষ্টা করে সেটা বোকামিরই নামান্তর হবে।

উল্লেখিত দু'টি নির্বাচনী ফলাফল ও একটি আগাম সমীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা তখনই বাড়বে যদি এর ভিত্তিতে কোনো যুক্তিনিষ্ঠ সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করা যায়।

(১) মনে রাখতে হবে ভোটদাতারা কখনই মিডিয়া পণ্ডিতদের মতো চটজলদি সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করেন না। আর সেই অনুযায়ী ভোটও দেন না।

(২) ঘরে তৈরি রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধ পরিবেশ দেখলেই ভোটদাতারা গলে গিয়ে নিজেদের মূর্খ প্রমাণ করতে রাজি নন। উলটে তাঁরা সরকারের কথা ধৈর্য ধরে শুনতে চান। সঙ্গে সরকারকে সময়ও দিতে চান। তাঁরা ঠিকই বুঝেছেন ক্ষমতা-বিচ্ছিন্ন অধৈর্য কংগ্রেস হঠাৎ করে যুদ্ধং দেহী মনোভাব গ্রহণ করে সরকারের মুণ্ডপাত করলেও তাঁরা জানেন মোদী সরকার কাজ শুরু করেছে (Work in Progress)।

এবার সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তা হলো বিশেষ কিছু অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সরকারের এখনই নেওয়া আশু প্রয়োজন না হলে সমূহ বিপদ হতে পারে। অবশ্যই সরকারের জনপ্রিয়তায় বড় ধরনের কোনো ঘাটতি সমীক্ষায় নজরে না এলেও ২০১৪ সালে যে বাঁধভাঙ্গা আবেগের ঢেউয়ে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল তাতে কিছুটা ভাটার টান আছে। এখনও কোনো জন-অসন্তোষ দেখা যায়নি কেননা জিনিসপত্রের দাম সেভাবে বাড়েনি সাম্প্রতিক পেঁয়াজের দাম ছাড়া। এটিকে ব্যতিক্রম ধরলে ভুল হবে না।

কিন্তু মনে রাখতে হবে মোদী সরকার 'সুদিন' আনার প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকারে ক্ষমতায় এসেছিল। তাই মোদীর কাছে জনতার ইচ্ছাপূরণের দাবি অত্যন্ত তীব্র। অন্যভাবে বলা যেতে পারে চাকরি তৈরি ও জনতার হাতে সম্পদ তৈরি এই দু'টি ক্ষেত্রে যদি সরকার সাফল্য না আনতে পারে তাহলে সরকার তার নিজের জালেই অর্থাৎ স্বখাত সলিলেই ডুববে।

যাই হোক, এগুলি ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। তবে ঘনায়মান বিহার নির্বাচন কিন্তু নির্ধারিত হবে স্থানীয় বিষয়ের গুরুত্বে, স্থানীয় নির্বাচক মণ্ডলীর মানসিকতা ও সর্বোপরি স্থানীয় ভোট প্রচারের অভিঘাতের ওপর। কেননা একটু ভেবে দেখলেই দেখবেন জাতীয়স্তরে দেশ কিন্তু এখন একটি শান্ত বাতাবরণের মধ্যে রয়েছে, অবশ্যই কিছু কিছু টিভি চ্যানেলে উৎপাদিত কাল্পনিক অস্থিরতা ছাড়া।

(লেখক বিশিষ্ট সংবাদ ভাষ্যকার)

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website :

www.calcuttawaterproofing.com

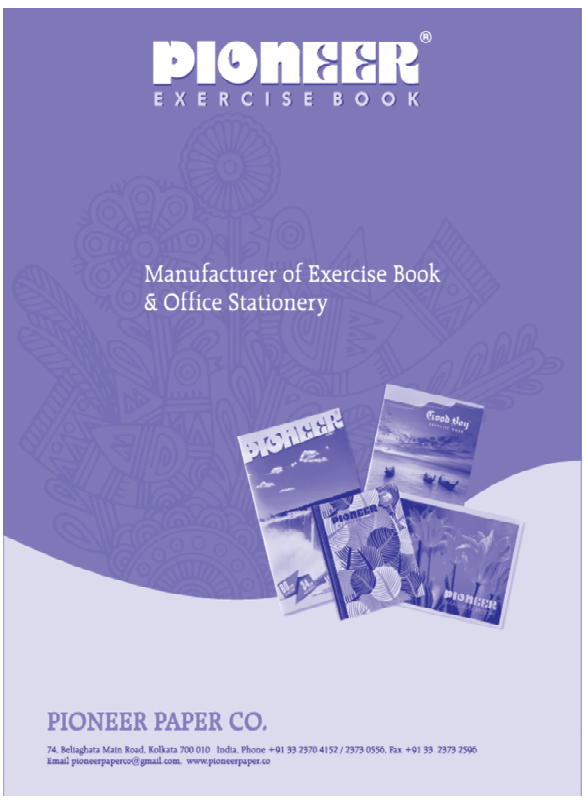

চিঠিপত্র

ছিটমহল হস্তান্তর

'হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে মানবাধিকার কমিশনের নোটিশ' ১৭ আগস্ট তারিখে স্বস্তিকায় প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদন প্রসঙ্গে অনিবার্য কয়েকটি কথা। এ এক আত্মঘাতী জাতির আত্মঘাতী প্রবণতা যেখানে নেতানেত্রীরা নেতা-নেত্রীসুলভ ভান করেন কিন্তু নেতৃস্থানীয় কাজ করেন না। হয় তারা জনগণকে বোকা বানায় নচেৎ তারা নিজেরাই বে-বোধ। এ তো জানা কথা যে বাংলাদেশে ভারতীয় ছিটমহলবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার বাংলাদেশ করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো--- ১৯৪৭ সালে গান্ধী-নেহেরুর যুগ্ম জাতীয়তাবিরোধী সূক্ষ্ম চক্রান্তের ফলে দেশের বিশালায়াতন জমি ভাগ করে দিয়েছিল অথচ বিভাজিত জমির লোকসমূহ রেখে দিয়েছিল এবং তার জাতিবিধ্বংসী ফল টের পাচ্ছে ভারত। আজ আবার দেশের অংশ ভাগই হলো, তাহলে আজ আবার কী করে ৪৭-এর সমান ভুল করা হলো? জমি বিনিময় হয়ে গেল, সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের সেই সেই দেশ ফিরিয়ে নেবে, এটাই তো বিভাজন-নিয়মে আসে। ভারতের মাটিতে বাস করা বাংলাদেশি ১৪-১৫ হাজার লোকদের আগবাড়িয়ে বলা হলো ''যারা ভারতে থাকতে চায়, তারা যেন আবেদন করে।'' সবাই থাকতে চাইছে। অপর দিকে বাংলাদেশে বসবাসরত অধিকাংশ হিন্দু (৯০ শতাংশ প্রায়) ভারতে চলে আসতে চাইছে— চাইছে নয়, আসতে তাদের হবেই। বাংলাদেশ বিলক্ষণ জানে যে ভারত থেকে কেউই আসবে না। বাংলাদেশের ছিটমহলের সমস্ত লোক-সহ সারা দেশের অন্য হিন্দুদের মেরে খেদাবে ভারতে। তার মানে জমি বিনিময় করে লব্ধ জমিতে জনসংখ্যা দ্বিগুণ করে নেওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন হলো। এখানকার ছিটমহলের মুসলমানরা ওদেশে চলে যাবে আর ওখানকার ছিটমহলের হিন্দুজনগণ এদেশে চলে আসবে। এটাই নিয়ম। আমার বক্তব্য, ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর কী করে এটা মেনে নিল? এটা তো কেন্দ্রের বিষয়? তাহলে অনুপ্রবেশ নিয়ে এত কঠোরতার মানে কী? দেশবাসী ওদের দেশ চালানোর চাকরি দিয়েছে, কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর দেশবাসীর ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ করে যায় ওরা। অবাক ব্যাপার! 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে হিন্দু সম্পত্তি দখল করেছে কয়েক জায়গায়। ফরিদপুর জেলায় কালীমন্দিরের ১৮৬৯ শতক জমি দখল করেছে ওদেশের স্বাস্থ্য বিভাগ। শিব মন্দির ভেঙে তৈরি করছে কারাগার কক্ষ। জগন্নাথ মন্দিরে ১.৩২ একর জমি দখল করে রেখেছে জেলা প্রশাসক। আরো অনেক খবর প্রকাশের সুযোগ পায় না। সখ করে বিষপান করার এক অদ্ভুত ফ্যাসান চলছে দেশে ১৯২৪ সাল থেকে। সেই সখ আপন মৃত্যু ডেকে আনবে, নাকি অস্তিত্ব বিনাশ ঘটাবে সেই বোধই নেই।

—টিমিড পেনস্পিকার,
বর্ধমান।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক

আবার জঙ্গি আক্রমণে আক্রান্ত হলো ভারত। গত আগস্ট ২০১৫-তে পাকিস্তান থেকে ভারতে সীমান্ত পেরিয়ে এসে হামলা করে ধরা পড়ল এক সন্ত্রাসবাদী। সে স্বীকার করেছে পাকিস্তান থেকে এই হামলার জন্যই কাশ্মীরে ঢুকেছিল। এর সঙ্গের এক জঙ্গি আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান ভর্তি বাসে ওঠার চেষ্টা করে গুলি বর্ষণ করতে করতে। এতে দু'জন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান প্রাণ হারান এবং ১০ জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে এক জঙ্গি মারা যায়, দু'জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধৃত জঙ্গি স্বীকার করেছে— তাদের চারজনকে একসঙ্গে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ভারতে ঢুকে 'হিন্দুদের মারার জন্য'। গত সপ্তাহেও পাঞ্জাবের দীনানগরে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গি আক্রমণে পাঁচজন পুলিশ-সহ আটজন প্রাণ হারালেন। এই সমস্ত ঘটনায় আমাদের দেশের স্বঘযোতি ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা এখন মুখে কুলুপ এঁটে আছেন।

অথচ ১৯৯৩ সালের মুম্বই বিস্ফোরণের এক চক্রান্তকারীর ফাঁসির জন্য ভারত দ্বিধাবিভক্ত। একপক্ষ আদালতকে সম্মান জানিয়ে ফাঁসির পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেছেন, অপর পক্ষ ওই কাপুরুষ, ঘৃণ্য কুলাঙ্গারকে মহান করে তোলার জন্য 'চোখের পানিতে' বুক ভাসিয়ে দিচ্ছেন। এই দলের মধ্যে বামপন্থীরা, ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ (যাদেরকে লোকে ঘেন্না করে), মানবাধীকার কর্মীরা এবং কিছু শিক্ষিত নামধারী বুদ্ধিজীবীরা।

ভারত সরকারের এবার বুঝি ভাববার সময় এসেছে। ভারত পাকিস্তানের মতো একটা অসভ্য দেশের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শান্তিতে বসবাস করার যতই চেষ্টা করুক, পাকিস্তান তা হতে দেবে না। কেননা পাকিস্তানের জন্মই হয়েছে ভারত বিরোধিতা করে। আরও মনে রাখতে হবে, কুকুরকে বশ মানাতে হলে মুগুর মারতেই হবে। ভারত যে কেন পাক জঙ্গি আক্রমণের জবাব কড়া হাতে মোকাবিলা করছে না তা বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। যে যে ভাষা বোঝে তার সঙ্গে সেই ভাষাতেই কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ। পাকিস্তানের সঙ্গে আর বন্ধুত্ব নয়।

—সাতকড়ি ভঞ্জ,
গাজল, মালদা।

বাঙালি মনীষার মর্যাদা

কয়েকদিন আগে জনৈক তৃণমূল নেতা একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন বাম আমলে মার্কস লেনিনের খুব রমরমা ছিল। ছিল না বাঙালি মনীষার মর্যাদা। কথাটি সর্বাংশে সত্য। রাশিয়াতেও তাই হয়েছিল। কিন্তু হিটলারের আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষায় মার্কস-লেনিনের নাম করে স্টালিন দেশবাসীকে এগিয়ে আনতে পারেননি।

পেরেছিলেন রাশিয়ার অতীত দিনের সাড়াজাগানো মনীষীদের স্মরণ করিয়ে। আর ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে বাংলার মনীষীদের স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেওয়াই ছিল একমাত্র কাজ। তবে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অধ্যাপক ভি. এস. কোডুচেনকভ ১৯৭০ সালে অরবিন্দ সম্পর্কে ও ১৯৭৭ সালে বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর পুস্তক প্রকাশ করেন। তারপর থেকে বিবেকানন্দকে রাশিয়ায় সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারই ফলস্বরূপ উত্তর আমেরিকার চিকাগো শহরের ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ভাষণে বিশ্বজয় করার পর নয়, এমনকী তাঁর মৃত্যুর সময়ও নয়, তাঁর মৃত্যুর ৭৫ বছর পর এই সেদিন ১৯৭৭ সালে ভারতীয় কমিউনিস্টরা রাশিয়ার অনুকরণে বিবেকানন্দকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাম আমল ছাড়াও কংগ্রেসী আমলেও কি বাঙালি মনীষাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল বা এখনও দেওয়া হয়? রাজনৈতিক লাভের অঙ্ক মাথায় রেখে বছরে একদিন দায়সারা ভাবে স্মরণ করলেও তাদের অন্তরে ওইসব মনীষীদের প্রতি কোনো মর্যাদাবোধ আছে বলে মনে হয়? এ তো গেল বর্তমানের কথা। একবার অতীতের দিকে তাকান।

গান্ধীজীর প্রার্থীকে পরাজিত করার অপরাধে সুভাষ চন্দ্র বসুকে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে কাজ করতে না দেওয়ায় বিপ্লবী সাভারকরের পরামর্শে সুভাষ বসুর গোপন দেশত্যাগ, আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন ও সংগ্রামের কারণেই যে বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিল— সে কথা বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি স্বীকার করতে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই এটলিকেই নেহরু চিঠি লিখেছিলেন, যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করে সুভাষ বসুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে না কেন? বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার সময় নেহরু বলেছিলেন বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। বাঙালি মনীষার প্রতি কি অপূর্ব মর্যাদা! (সূত্র : ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধ— বর্তমান ২.৮.১৫)

জিন্নার সঙ্গে সোচ্চারে পাকিস্তানের দাবি তোলা কবি ইকবালের প্রকৃত স্বরূপ না বুঝে বা তার কবিতা না পড়েই বাংলার অনেকেই ইকবালকে মহান করে তুলেছেন। অথচ পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করে কাঁদতে কাঁদতে যে সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খান পাকিস্তান যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি অস্পৃশ্য, তাঁর কথা কেউ বলে না। সকলের অবগতির জন্য মহান ইকবালের একটি কবিতা তুলে ধরছি।

''বলিতে পার কি ভুলেও কি কেহ
কোনদিন নিত তোমার নাম?/ মুসলমানেরি
বাহুর বলেতে পুরিয়াছে তব মনস্কাম/ কিন্তু
হে প্রভু, কে তোমার লাগি তুলেছে কৃপান
দূর্নিবার?/ কে রয়েছে বল, নূতন করিয়া
শৃঙ্খলাহীন এ সংসার। (সূত্র : কবিতা
শিক্ওয়া (অভিযোগ) ইকবালের কবিতা
সঞ্চয়ন, মনিরউদ্দিন ইউসুফ ইসলামিক
ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)।

তাই যতদিন কংগ্রেস দল বা কংগ্রেসের প্রকৃত দাবিদার (যে নামেই হোক) থাকবে ততদিন বাঙালি মনীষার অমর্যাদা চলবেই।

—**অমল বসু,**
বাগনান।

তিতুমিরকে নিয়ে মিথ্যা প্রচার

'ফরাওজি' আন্দোলনের নেতা হাজি শরিয়তুল্লাহ্ (১৭৮১- ১৮৪০) বাংলাদেশের মাদারীপুরের লোক ছিলেন। এক 'ওয়াহাবি' আন্দোলনের সংগঠক হাজি তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১) যার প্রকৃত নাম মির নিসার আলির বাড়ি ছিল ২৪ পরগনার চাঁদপুর। পৃথক পৃথকভাবে সমকালের এই দুই ব্যক্তি মক্কায় গিয়ে ইসলামের মৌলবাদী মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে দেশে ফিরেন। এবং নিজ নিজ এলাকায় মুসলমানদের সংগঠিত করে ইসলামি মৌলবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। আন্দোলনের নাম ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য ছিল, হিন্দু জমিদার ও বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' (ইসলাম প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ) করে 'দারুল ইসলাম' (ইসলামি শাসন) কায়েম করা। তিতুমির যে বাঁশের কেল্লা গড়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছিল তা ভারতের স্বাধীনতার জন্য মোটেই ছিল না। সে ২৪ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে একটি ইসলামি রাজত্বে কিছুকালের জন্য হলেও প্রতিষ্ঠা করে। এবং মন্ত্রী ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করে যথাক্রমে মিসকিন খাঁ ও গোলাম মাসুম খাঁকে। তিতুমিরের প্রকৃত ইতিহাস আছে সুলেখক ড. রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের 'নবরূপে তিতুমির' ও অন্যান্য কিছু ইতিহাস গ্রন্থে। মুসলমানদের প্রতি কোরানে আল্লাহ্র কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' করার (কোরান ২/১৯৩; ৮/১২, ১৩, ৩৯, ৯/৫, ২৯, ৩৯ ইত্যাদি)। তিতুমির মক্কা থেকে সেই শিক্ষা পেয়ে দেশে এসে তা প্রয়োগ করেছিল। এবং তাতেই তার মৃত্যু ঘটে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য নয়। ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, গত বামফ্রন্ট ও বর্তমান সরকার তিতুমিরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদের মর্যাদা দিয়ে নানা মিথ্যা প্রচার করছে। সম্প্রতি 'তিতুমির' নামে একটি নাটক 'আকাশবাণী' প্রচার করেছে। তাতেও তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নায়কের মর্যাদা দানের চেষ্টা লক্ষণীয়। রাজনৈতিক দলগুলির এসব চেষ্টা মুসলমানদের খুশি করে তাদের ভোট পাওয়ার একটি কৌশল মাত্র। ইতিহাসের সত্য ঢেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করা অপরাধ। বারাসাত বাসস্ট্যান্ডে তিতুমিরের নাম সম্বলিত বিরাট সাইন বোর্ডটি গত ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিথ্যাচারিতার এক স্পষ্ট উদাহরণ। এবং তা যতদিন থাকবে ততদিন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষকে একটি নির্জলা মিথ্যা ধারণা দিতে থাকবে।

—**কমলাকান্ত বনিক,**
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

ARE YOU SEARCHING FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY

BUY SALE RENT

Contact
DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945
RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

নাগা শান্তিচুক্তি কি ভারতের ঈশানকোণে নতুন ভোরের সঙ্কেত?

সাধন কুমার পাল

বিগত ছয় দশক ধরে নাগা শান্তিচুক্তির পথে মূলত দু'টি বাধা মুখ্য হয়ে উঠেছিল। এক, সার্বভৌমত্বের দাবি। দুই, ১৬৫২৭ বর্গ-কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট নাগাল্যান্ডের সঙ্গে অসম, মণিপুর ও অরুণাচল প্রদেশের নাগা অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে ১২০০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা বিশিষ্ট বৃহত্তর নাগালিম গঠনের দাবি। গ্রেটার নাগালিম গঠনের সপক্ষে নাগাল্যান্ড বিধানসভা ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালের আগস্ট, ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সালের ডিসেম্বর এবং অতি সম্প্রতি চলতি বছরের ১৭ জুলাই-সহ পাঁচবার প্রস্তাব পাশ করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই নিজ নিজ রাজ্যের ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রশ্ন নিয়ে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ছড়িয়েছে প্রতিবেশি অসম, অরুণাচল ও মণিপুরে। এই বিষয়টি এতটাই স্পর্শকাতর যে দিল্লি ও এন এস সি এন (আই এম)-এর মধ্যে ১৯৯৭ সালের সংঘর্ষ বিরাম চুক্তি ২০০১ সালে আরো এক বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করার সময় প্রতিবেশী রাজ্যের নাগা অধ্যুষিত এলাকা এই চুক্তির আওতায় আনার জন্য ''and other areas'' এই শব্দ বন্ধটি জুড়ে দেওয়ার মধ্যে বৃহত্তর নাগালিম গঠনের ষড়যন্ত্র দেখতে পেয়ে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মণিপুর। এর প্রতিবাদে টানা বনধের ডাক দেওয়া হয়। ওই বছরের ১৮ জুন আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মণিপুর বিধানসভা ভবন ও সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ। এতে ১৩ জনের মৃত্যু ও আহত হয়েছিল ৫০ জনের মতো।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া

চুক্তি স্বাক্ষর করতে হলে দেশের কোনো সরকারের পক্ষেই সার্বভৌমত্বের শর্ত মানা সম্ভব নয়। নাগাল্যান্ডের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে এলাকা যুক্ত করে বৃহত্তর নাগালিম গঠনের শর্ত রেখে চুক্তি স্বাক্ষর করা অসম্ভব। পড়শি তিন রাজ্যই জানিয়েছে, নাগা চুক্তির স্বার্থে তারা কোনো অঙ্গহানি বা প্রশাসনিক বদল মানবে না। এর মধ্যেই মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওক্রাম ইবোবি সিংহ

আরও একবার তা স্পষ্ট করে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে চুক্তির শর্তে যদি অন্য রাজ্যের সীমানা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা হয়, সেক্ষেত্রে শান্তির বদলে অশান্তির অগ্নিবলয়ে পরিণত হবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল। এই প্রেক্ষাপটে গত ৩ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের উপস্থিতিতে দিল্লী ও এন এস সি এন (আই এম)-এর মধ্যে নাগা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির বয়ান প্রকাশ্যে না এলেও সার্বভৌমত্ব ও সীমানা বিবাদের বাধা অতিক্রম না করে যে শান্তিচুক্তি সম্ভব নয় এই ধারণা থেকেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় অসম, অরুণাচল ও মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রীরা এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। যদিও পরে রাজনৈতিক কারণে দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে এই মুখ্যমন্ত্রীদেরও বিজেপি-কে কোণঠাসা করার জন্য চুক্তির গোপনীয়তা নিয়ে সরব হতে দেখা যায়। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে আর এন রবি ও এন এস সি এন (আই এম)-এর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী থুইগ্যালেং মুইভার প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও কিন্তু নাগাশান্তি চুক্তির পথে প্রধান বাধাগুলি কাটিয়ে ওঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সার কথা হলো এই চুক্তি শুধুমাত্র সমস্যার সমাধানই নয়, বরং নতুন ভবিষ্যৎ শুরুর ইঙ্গিতবাহী। আগামী দিনে শুধুমাত্র পুরনো ক্ষতে প্রলেপ দেওয়াই নয়, সহযোগী হয়ে নাগাদের ঐতিহ্য ও সম্মান রক্ষার অঙ্গীকারের সুরও ধ্বনিত হয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। নাগা বার্তার কাজে নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর দূত আর এন রবির প্রতিক্রিয়ার সুরও ছিল নাগাদের ভাষা ও ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য সম্মানের সঙ্গে সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকারে বাধা। এন এস সি এন (আই এম)-এর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী মুইভার প্রতিক্রিয়াতেও উঠে আসা শব্দবন্ধ যেমন 'Nagas are entering into a new relationship with the Govt. From now', 'Beginning from now new challenges will be great'— স্পষ্টতই হিংসা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনা থেকে সরে এসে মূলস্রোতে ফিরে আসার ইঙ্গিত দেয়। মুইভার বক্তব্য অনুসারে নাগাদের অদ্বিতীয় ইতিহাস ও অবস্থান এবং গণতন্ত্রে মানব সত্ত্বার সার্বভৌম অবস্থানের বিশ্বজনীন নীতির উপর ভিত্তি করেই এই চুক্তির ধাঁচা তৈরি করা হয়েছে। এই বক্তব্য থেকেও কয়েক দশক ধরে চলে আসা সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে।

নাগা বিদ্রোহের শুরুর ইতিহাস

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই নাগা সমস্যা উদ্বেগে রেখেছে দিল্লীকে। নাগা গোষ্ঠীগুলির এই প্রতিরোধ-কে পৃথিবীর দীর্ঘতম বলে মনে করা হয়। ১৮৮১ সালে নাগা পাহাড় বৃটিশ ভারতের আওতায় আসার সময় নাগা ক্লাব গড়ে এর বিরোধিতা করা হয়। ১৯২৯ সালে নাগা ক্লাবের তরফে সাইমন কমিশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়— 'Leave us alone to determine ourselves as

in ancient times'. ১৯৪৬ সালে আঙ্গামি ফিজোর নেতৃত্বে গঠিত হয় নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল (এন এন সি)। নাগা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭-এর ২৯ জুন অসমের গভর্নর কয়েকজন মডারেট নাগা নেতার সঙ্গে ৯ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করলে ফিজো তা মানতে অস্বীকার করেন এবং ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেন। ফিজোর নেতৃত্বে এন এন সি ১৯৫১ সালে নাগাল্যান্ডের পক্ষে রায় দেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন বয়কট করে সেই বছরই ২২ মার্চ ফিজো ভূমিগত নাগা ফেডারেল গভর্নমেন্ট (এন এফ জি) ও নাগা ফেডারেল আর্মি গঠন করেন (এন এফ এ)। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার সেনাবাহিনী পাঠায়। সে সময় ফিজো পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পরে ১৯৬০ সালে লন্ডনে পালিয়ে যায়। ১৯৫৮ সালে নাগাল্যান্ডে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু হয়।

ইতিহাসের দীর্ঘতম শান্তি প্রয়াস

অসমের একটি জেলা হিসেবে থাকা নাগাল্যান্ড ১৯৬৩ সালে পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করে। পরের বছর জয় প্রকাশ নারায়ণ, অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা ও রেভারেন্ড মাইকেল স্কট নাগা শান্তিমিশন গঠন করলেও ফিজো শান্তি আলোচনায় রাজি না হওয়ায় সেটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৭৫ সালের ১১ নভেম্বর এনএনসি ও সরকারের মধ্যে শিলং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে এন এন সি এবং এন এফ জি-এর একাংশ অস্ত্র সমর্পণে রাজি হয়। কিন্তু সে সময় চীনে বসবাসরত থুইগ্যালেং মুইভার নেতৃত্বে ১৪০ জন সদস্যের একটি গোষ্ঠী শিলং চুক্তির বিরোধিতা করে এন এস সি এন গঠন করে। আইজ্যাক স্যু ও কে কে খাপলাং সে সময় মুইভার সঙ্গেই ছিলেন। ১৯৮৮ সালে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের পর এন এস সি এন বিভক্ত হয়ে এন এস সি এন (আই এম) এবং এন এস সি এন(কে) গঠিত হয়। এদিকে এনএনসি-র প্রভাব কমতে থাকে। ১৯৯১ সালে লন্ডনে ফিজোর মৃত্যু হয়। সবচেয়ে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী বিদ্রোহী গোষ্ঠী হিসেবে এন এস সি এন (আই এম) হয়ে ওঠে উত্তর পূর্বের সমস্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর গাইড অ্যান্ড ফিলোসফার।

১৯৯০-এর শুরুতেই মুইভা-সহ এন এস সি এন (আই এম)-এর উঁচু স্তরের নেতারা ব্যাঙ্ককে পালিয়ে যায়। নাগাল্যান্ডের তৎকালীন রাজ্যপাল এম এম থমাস, কেরলের একজন খৃষ্টান ধর্মযাজকের উদ্যোগে এই বিদ্রোহী নেতারা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় রাজি হয়। ১৯৯৫-এর ১৫ জুন প্যারিসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাও মুইভা ও আইজ্যাক স্যু-এর সঙ্গে কথা বলেন। ওই বছরের নভেম্বরে এই সাক্ষাতের সূত্র ধরে ব্যাঙ্ককে মিনিস্টার অফ স্টেট (হোম) রাজেশ পাইলটের সঙ্গে মুইভা ও আইজ্যাক স্যু-র কথা হয়। এর পর ১৯৮৭-এর ৩ ফেব্রুয়ারি জুরিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার সঙ্গে একটি বৈঠক এবং এই বৈঠকের ফলোআপ হিসেবে ভারত সরকারের নিযুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে জেনেভা ও ব্যাঙ্ককে আলোচনা হয় নাগা বিদ্রোহী নেতাদের। ১৯৯৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্যারিসে মুইভা ও স্যু-র সঙ্গে কথা বলেন। ১৯৯৭ সালের ২৫ জুলাই এন এস সি এন (আই এম)-এর সঙ্গে ভারত সরকারের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যা কার্যকর হয় ওই বছরের ১ আগস্ট থেকে। এর পরেও নাগা নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ১০০টির মতো বৈঠক হয়।

কেন এই গোপনীয়তা?

নাগা সমস্যা শুধুমাত্র নাগাল্যান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিও এর দ্বারা প্রভাবিত। সেজন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চুক্তির সমস্ত দিক চূড়ান্ত না করে শুধুমাত্র চুক্তির ধাঁচা সামনে এলে ভুল বোঝাবুঝির জেরে সমস্ত উদ্যোগ ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও মুইভা।

থেকে যায়। তাছাড়া কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে চুক্তি প্রকাশ্যে আনার আগে পার্লামেন্টে পেশ করা হবে। স্পষ্টতই এই গোপনীয়তা পদ্ধতিগত। নীতিগত নয়। ফলে এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না।

এমনও হতে পারে চুক্তির ধাঁচা সামনে এলে ভুল বোঝাবুঝির জেরে চুক্তি স্বাক্ষরকারী সংগঠন হিসেবে এন এস সি এন (আই এম) সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। কারণ এন এস সি এন (আই এম) উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী হলেও একমাত্র জঙ্গিগোষ্ঠী নয়। তাছাড়া মুইভা নিজে মণিপুরের টাংখুল নাগা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। সমগ্র নাগাল্যান্ডকে প্রতিনিধিত্ব করার স্বীকৃতিও প্রশ্নাতীত নয়। তাছাড়া এন এস সি এন (আই এমের) লড়াই ছিল বৃহত্তম নাগালিমের জন্য। চুক্তিতে যদি কোনো ভাবে বৃহত্তর নাগারাজ্য গঠনের শর্ত না থাকে, সেক্ষেত্রে মুইভা যে গোষ্ঠীর মানুষ, সেই টাংখুল নাগাদের প্রাধান্য রয়েছে এন এস সি এন আই এমে। কিন্তু তার বাইরে আম নাগা জনমানস এবং দলের শীর্ষ নেতাদের কাছে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে মুইভাকে।

প্রকাশ্যে না এলে প্রধানমন্ত্রী কেন এই চুক্তিকে ঐতিহাসিক বললেন?

ভারত সরকারের শান্তি আলোচনা চলছে আজ দীর্ঘ পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মতো ঐতিহাসিক ক্ষণটি মোদী সরকারের এক বছরের মতো সময়কালের মধ্যেই তৈরি হলো কেন? এর দুটো কারণ হতে পারে। এক, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অটলবিহারী বাজপেয়ী শুধু নাগা জনমানসই নয় নাগা বিদ্রোহীদেরও বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছিলেন। ২০০৩ সালের ২৮ অক্টোবর কোহিমাতে ভাষণ দিতে গিয়ে বাজপেয়ী নাগা ভাষায় বলেছিলেন 'আমি লাগা ভাই আরো বহিনো খান। আমি নাগাল্যান্ডতে মিটিয়া কারুনে বিশি খুশি পাইসে...' (আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা। নাগাল্যান্ডের মাটিতে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত।) হাততালিতে ফেটে পড়েছিল সভাস্থল। সেদিন অটলজী আরো বলেছিলেন দেশের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে নাগাল্যান্ডের অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। আমরা সেই ইতিহাসের ব্যাপারে সংবেদনশীল। এই অদ্বিতীয় স্বাতন্ত্র্য কখনই নাগা জনগণের দেশপ্রেমে ফাটল ধরাতে পারেনি। শহীদ যদুনাং এবং রানী গাইদিনলু'র দেশপ্রেম এখনো আমাদের প্রেরণা দেয়। ১৯৬২, ১৯৬৫ ও ১৯৭১-এর যুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে ভূমিগত নাগা বিদ্রোহীরা যে ভারতীয় সেনার দিকে বন্দুক তাক করেনি সে কথা আমারা ভুলিনি।

ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী দুজনের কেউ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কোহিমায় যাননি। ১৯৫৩ সালের ৩০ মার্চ কোহিমায় অনুষ্ঠিত জনসভায় একটি গোষ্ঠীর পেশ করা সার্বভৌমত্বের দাবি নাকচ করার পর সভায় উপস্থিত ৫০০০ মানুষ প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সভাস্থল ফাঁকা করে চলে গিয়েছিলেন। নাগা নেতারা এখনো বলেন ওই ঘটনার জেরে সেদিন নাকি নেহরু এত রেগে গিয়েছিলেন যে মঞ্চে দাঁড়িয়েই এক ভারতীয় আধিকারিককে বলেছিলেন 'সেন্ড আর্মি অ্যান্ড কিল নাগাস। 'যা শুনে আশেপাশে থাকা নাগা নেতারা শিউরে উঠেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোরারজী দেশাই ও দেবেগৌড়া কোহিমায় গেলেও নাগা জনগণের কাছে বাজপেয়ীজীর মতো এতটা কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী মোদীও বলেছেন বাজপেয়ী সরকার যেখানে শেষ করেছিল বর্তমান সরকার সেখান থেকেই নাগা বার্তা শুরু করেছে। হতে পারে উত্তরাধিকার সূত্রে অটলবিহারী বাজপেয়ীর অর্জিত বিশ্বাস ও আস্থার জেরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খুব সহজেই নাগা বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন।

দুই, নাগা সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্যোগ, আন্তরিকতা ও পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চোখ রাখলেই এই চুক্তির ভিত

রচনার সাফল্যের নেপথ্য চিত্রটি ধরা পড়বে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন এক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরানো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টি তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে রেখেছেন। রাজনীতির ভাষায় এই অগ্রাধিকারের পোশাকী নাম 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'। প্রাক্তন গৃহসচিব কে পদ্মনাভাইয়ার কথায় গত ১২ বছরে তিনি কমপক্ষে ১০০ বার নাগা নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছেন। এর আগেও কয়েকবার বরফ গললেও কেন্দ্রের দৃঢ়তা রাজনৈতিক অগ্রাধিকারে উত্তরপূর্ব না থাকার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের মতো অবস্থায় পৌঁছানো যায়নি। বর্তমানে পালটেছে নাগাল্যান্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। মুখ্যমন্ত্রী টি আর জেলিয়াং-য়ের নাগা পিপলস ফ্রন্ট এখন এন ডি এ জোটে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় সমস্ত গোষ্ঠী এমনকী কংগ্রেসকেও সর্বদলীয় সরকারের অংশীদার করার জন্য লেগে রয়েছেন। সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ ও উত্তরপূর্বাঞ্চল বিশেষজ্ঞ পিবি আচারিয়া এখন নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল। নাগা বার্তার জন্য নিযুক্ত জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আই বি ব্যাকগ্রাউন্ডের আর এন রবি উত্তরপূর্বাঞ্চল বিশেষজ্ঞ।

উত্তরপূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী জঙ্গিগোষ্ঠী কট্টরপন্থা ছেড়ে মূল স্রোতে আসতে চাইছে কেন?

গত ৯ জুন মায়ানমারের ভিতরে ঢুকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে চলা ভারত সরকার যেভাবে জুনের ৪ তারিখে মণিপুরে খাপলাং গোষ্ঠীর আক্রমণের জবাব দিয়েছে তাতে সন্ত্রাসবাদের প্রতি বর্তমান সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি প্রতিফলিত। হতে পারে সরকারের বর্তমান নীতির চাপ আইজ্যাক স্যু বা মুইভা-র মতো পোড় খাওয়া বিদ্রোহী নেতাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিই সার্বভৌমত্ব ও গ্রেটার নাগালিমের দাবি ছেড়ে দিয়ে এন এস সি এন (আই এম)-এর মধ্যে এখন ভারতের মধ্যে থেকেই একটা সমাধান খোঁজার মানসিকতা তৈরি করছে। ফলে তাদের দাবি না-মানা সত্ত্বেও জঙ্গলে গিয়ে ফের গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার মতো অবস্থায় তারা আছে বলে মনে হয় না। আইজ্যাক স্যু বা মুইভা-র মতো যেসব নাগা নেতারা একদিন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সে দেশে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে নাগাল্যান্ডে লড়াই করেছেন— তারাও কিন্তু আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দিল্লী এসে মাঝে মাঝে আলোচনায় বসা আর বোঝাপড়ার রাস্তাটা খুলে রাখতেই বেশি আগ্রহী। 'প্রায় সাত দশক ধরে এই সশস্ত্র পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলে কি পেয়েছি'— এই ভাবনাও নাগা নেতাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ খুঁজতে বাধ্য করতে পারে।

উলটো সুর কেন?

নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রতি বছর ১৪ আগস্ট নাগা স্বাধীনতা দিবস পালন করে। এবছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। গত ১৪ আগস্ট এন এস সি এন (আই এম)-এর সদর দপ্তর নাগাল্যান্ডের হেব্রনে নাগা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ভূমিগত নাগা ফেডারেল গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে থুইগ্যালেং মুইভা বলেন, নাগাদের পক্ষে কখনোই সার্বভৌমত্ব ও সংযুক্তিকরণের দাবি থেকে সরে আসা সম্ভব নয়। অথচ চুক্তি সম্পাদনের সময় দিল্লীতে এমন একটি কথাও বলেননি যাতে মনে হতে পারে সার্বভৌমত্ব ও সংযুক্তিকরণের দাবি থেকে এন এস সি এন (আই এম) এখনো সরে আসেনি। এ যেন অনেকটা বিমল গুরুংদের মতো অবস্থা। একদিকে সরকারের সঙ্গে সহমত হয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রয়াস করা এবং অন্যদিকে সেন্টিমেন্টকে ধরে রাখতে মাঝে মাঝে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে হুমকি দেওয়া। তবে এই পথটাও মন্দ নয়— সাপও মরল লাঠিও ভাঙ্গল না। শোনা যাচ্ছে কেন্দ্র নাগাল্যান্ডের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে নাগা অটোনমাস কাউন্সিল গড়ে নাগা জনগণের গ্রেটার নাগাল্যান্ড ও সার্বভৌমত্বের আবেগকে মর্যাদা দেওয়ার প্রয়াস চালাবে। সেই সঙ্গে নাগাল্যান্ডে বিশেষ পুলিশবাহিনী গড়ে ও যোগ্যতানুসারে সেনাবাহিনীতে স্থান দিয়ে এন এস সি এন (আই এম)-এর ক্যাডারদের পুনর্বাসনের প্রয়াস চালাবে। ''বছরের পর বছর ধরে দেখা গেছে উত্তরপূর্বাঞ্চলের সার্বভৌমত্বের দাবিদার বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী যুদ্ধে এমনকী শান্তি স্থাপনেও তাকিয়ে থাকতো এন এস সি এন (আই এম)-এর দিকে— যেমন আলফা নেতা পরেশ বড়ুয়া বিভিন্ন সময় নাকি বলতেন তিনি তাকিয়ে আছেন এন এস সি এন (আই এম) কোনোরকম শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে কিনা সেই দিকে। এই ব্যাপারে তিনি নাগা নেতাদের পথই অনুসরণ করবেন। সব মিলে উত্তরপূর্বাঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বলা যায়''—

এক, শুধু নাগাল্যান্ড নয়, এই চুক্তি উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির বিভিন্ন সময় ভূমিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তৎপরতা কমিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে।

দুই, এই চুক্তির ফলে নাগাল্যান্ডের আরেক জঙ্গিগোষ্ঠী এন এস সি এন (কে) নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে এই গোষ্ঠীকেও শান্তি প্রক্রিয়ায় সামিল হওয়ার দিকে ঠেলে দেবে।

তিন, এখন থেকে মাস তিনেক আগে এন এস সি এন(কে), আলফা (ইন্ডিপেন্ডেন্ট), এনডিএফবি(এস), কেএলও-এর মতো জঙ্গিগোষ্ঠী মিলে ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ওয়েস্টার্ন সাউথ ইস্ট এশিয়া (ইউ এন এল এফ ডব্লুউ) নামে একটি নতুন জঙ্গি ফ্রন্ট তৈরি হয়েছে। যার চেয়ারম্যান হয়েছেন কে কে খাপলাং। জুনের প্রথম সপ্তাহে ইউ এন এল এফ ডব্লুউ প্রথম পরীক্ষামূলক আঘাত হেনেছে মণিপুরে। এই চুক্তি বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর নতুন করে যৌথ ফ্রন্ট গঠনের প্রয়াসকে বড় ধাক্কা দেবে।

চার, এই চুক্তি চীনের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা পাঠাবে। কারণ এনএসসিএন(আই এম)-ই প্রথম জঙ্গি সংগঠন যারা চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতো এবং নানা শলা-পরামর্শও সারত। রিপোর্ট বলছে উত্তরপূর্বাঞ্চলে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ইউ এন এল এফ ডব্লিউ গঠনের পেছনে চীনের হাত রয়েছে। এমন সম্ভাবনাই বেশি যে নাগা শান্তি চুক্তি একদিকে উত্তরপূর্বাঞ্চলের জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে নৈতিক ভাবে দুর্বল করে আলোচনার টেবিল-মুখী করবে, তেমনি অন্যদিকে ভারত সরকারের গোয়েন্দা নজরদারির ক্ষমতাও অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। যা ভারতের বৈরী শক্তিগুলির জন্য অবশ্যই দুশ্চিন্তার কারণ।

এক তপোব্রতী শিক্ষক

ড. তিলক রঞ্জন বেরা

গত ১৮ আগস্ট, ২০১৫ সত্যব্রত সিংহের পরিচয় স্বর্গত সত্যদা হয়ে গেল। বেশ কয়েকবছর বয়সের কারণে বিভিন্ন রোগের সমস্যায় ছিলেন। ঠিকানা ছিল বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের কার্যালয় হাওড়া মহানগরে। প্রথমে হাওড়ায়, পরে কলকাতার নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার পরিসমাপ্তি। সত্যের প্রতি ব্রত নিয়েই জন্মেছিলেন বলে বাবা-মা'র দেওয়া নাম সার্থক।

সংসারী হয়ে ৪ পুত্র, ৩ কন্যার পিতা হয়েও এক সময়ে সংসার ও চাকুরি ছেড়ে সত্যের সত্যের সন্ধানে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা। নির্দেশ দিয়ে গেলেন— 'চললাম, খোঁজার চেষ্টা করো না।' পুত্র-কন্যাগণ বাবাকে খোঁজার চেষ্টা না করে সত্যের পথ খোঁজার চেষ্টা করলেন। দুই পুত্র ও এক কন্যা সত্যের পথে পা বাড়িয়ে সারাজীবন সানন্দে অতিবাহিত করলেন এবং আরও দুই কন্যা করে চলেছেন। প্রথম পুত্র দেবব্রত সিংহ (দেবুদা) বাবার মতোই চাকুরি ছেড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসাবে নিজেকে ভারতমায়ের কোলে সঁপে দিয়েছিলেন। তৃতীয় পুত্র সত্যদা যথারীতি পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক-সহ স্নাতক হয়ে ২২ বছর বীরভূম জেলার লোকপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করলেন। ছোটবেলা থেকেই সঙ্ঘের পরিবেশে থাকার কারণে সঙ্ঘের প্রচারক রথীনদার প্রেরণায় শিক্ষকতা ছেড়ে সঙ্ঘের প্রচারক হলেন। কথায় বলে 'আগের হাল যেদিকে যায় পরের হালও সেদিকে যায়'। মেধাবী ছাত্র, প্রথিত যশা শিক্ষক এবং সঙ্ঘের কার্যকর্তা হয়ে প্রথমে বীরভূম জেলা প্রচারক, ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারক, মেদিনীপুর বিভাগ প্রচারকের দায়িত্ব পালন করে সারা পশ্চিমবঙ্গে নিজের পরিচয় ও গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাভাবিকভাবেই ৯৩ সালে অখণ্ড বাংলা প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখের দায়িত্ব এসে গেল। প্রবীণ প্রচারকদের কাছে জানা গেল আজকের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগের প্রত্যন্ত গ্রামে সঙ্ঘের কাজ সত্যদাই শুরু করেছিলেন। প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ হয়ে নিজে যেমন পড়তেন, গান অভ্যাস করতেন তেমনই অন্যদের উৎসাহ দিতেন। ১৯৯৪ সালে আসানসোল সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে দেখতাম সারাদিন নিজের বিছানাতে ঠেংড়ীজীর 'সংকেত রেখা' বইটি খোলা অবস্থায় আছে। কাজের ফাঁকে যখন সময় পাচ্ছেন তখন ২/১ পাতা পড়ছেন।

বাহ্যিক জীবনে একটু আগোছালো থাকলেও জীবন লক্ষ্যে স্থির। আপন কাজে ও চিন্তায় অটল ছিলেন বলে জেদি মনে হোত। কথায় বলে— 'ঢেঁকি স্বর্গেও ধান ভানে'। ...এসে গেল 'বিদ্যাভারতী' অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সংস্থান 'বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব। ছাত্র, আচার্য, অভিভাবক তথা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষক হয়ে নিজের বিচার বুদ্ধি, সামাজিক বিচক্ষণতা, পূর্বশিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দিয়ে বিদ্যাবিকাশের কাজকে দ্রুত বিকশিত ও সমাজমুখী করলেন। সমিতির বিভিন্ন বৈঠকে আর্থিক বিকাশ নিয়ে অন্যান্য সদস্য মত প্রকাশ করলেও সত্যদার সমাজ ভিত্তিক চেতনার কাছে তা ধোপে টিকতে না। আপাতদৃষ্টিতে পুরনোপন্থী মনে হলেও তাঁর নেতৃত্বে আজ পর্যন্ত চলে আসা 'বিদ্যাবিকাশ' পরিচালিত শিশুমন্দির গুলি নিজগুণে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনগ্রাহ্য। শেষের কয়েক বছর শরীরের কারণে সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব ছেড়ে মার্গদর্শক হিসাবে কাজ করেছেন। দুই ভাই সংসারজীবন যাপন করলেও তিন বোনই বাবার পথ অনুসরণ করে 'সারদা মা'য়ের আশীর্বাদ নিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে কাজ করে চলেছেন। সবমিলিয়ে একই পরিবারের পিতা ও পাঁচ সন্তানের দেশজননীর কাজে আত্মনিয়োগ করার উদাহরণ যথার্থই বিরল। অগণিত স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা, শিশুমন্দিরের শিশু-ভাইবোন, আচার্য, আচার্যা, অভিভাবক সকলের ভালবাসাকে উপেক্ষা করে প্রকৃত সত্যের পথে অমৃতলোকে যাত্রা করলেন যেখানে অগ্রজ দেবুদা ও দিদির সঙ্গে নিরুদ্দেশ পিতার সন্ধান পাবেন এবং একসঙ্গে গান গাইবেন 'সত্যের ডাকে এসেছি এ পথে তবে কেন মিছে ভয়।...' ■

বাঁকুড়ায় প্রয়াত সত্যব্রত সিংহের স্মরণসভা।

কলকাতায় মহিলা সমন্বয় বৈঠক

গত ২২ আগস্ট কলকাতায় বনবন্ধু পরিষদের একলভবনে বিকেল ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় মহিলা সমন্বয় বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় মহিলা সমন্বয় সংযোজিকা গীতা গুণ্ডে।

প্রারম্ভিক বক্তব্যে রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির প্রান্ত কার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী বলেন, পরমপূজনীয় গুরুজী বিবিধ ক্ষেত্রের মহিলাদের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। হিন্দু সমাজ তথা নারী শক্তিকে পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রয়াস বাংলায় শুরু হয় ২০০৩ সালে।

গীতা গুণ্ডে তাঁর বক্তব্যে বলেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই মহিলারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নানা সমাজসেবামূলক কাজে অংশ নিচ্ছেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে পারিবারিক উন্নতি সাধন করছেন। শহরের শিক্ষিতা মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অনগ্রসর মহিলাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। শিশু প্রতিপালন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে মহিলাদের সচেতনতা আবশ্যক। বৈঠকে উপস্থিত মহিলাদের তিনি সমন্বয় বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে বলেন।

সভায় পূর্বনির্দিষ্ট চারটি বিষয়ে— মহিলা ও সেবা, মহিলা ও সমরসতা, মাতৃত্বের সৃজনাত্মক ভূমিকা এবং একাত্ম মানবদর্শন— যথাক্রমে অনুভব ব্যক্ত করেন শ্রীমতী পূরবী গুপ্ত, ড. রমা ব্যানার্জি, ধীশ্বরী নাগ এবং শ্রীমতী রীনা ব্যানার্জি।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, সংস্কার ভারতী, কল্যাণ আশ্রম, ভারতীয় জনতা পার্টি, মহিলা মোর্চা, সমাজসেবা ভারতী, বিবেকানন্দ কেন্দ্র প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিরা পারস্পরিক মত বিনিময় করেন।

স্টেট লিগাল লেজিসলেটিভ সেল, গো-রক্ষা বিভাগ, নমামি গঙ্গে ইত্যাদি ঘোষণা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহিলারা বক্তব্য রাখেন। একক উদ্যোগে সমাজ সেবামূলক কাজে অগ্রণী মহিলাও উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে।

বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলেন নেতাজী গবেষক ও লেখিকা ড. পূরবী রায় এবং ক্যালকাটা ক্লাবের পরিচালন সমিতির অন্যতমা সদস্য ও বৈদেশিক রপ্তানি ব্যবসায় যুক্ত কস্তুরী রাহা। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মহুয়া ধর, মায়া মিত্র, মৌসুমী কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গৃহবধূ, আইনজীবী, সঙ্গীতশিল্পী, ছাত্রী-সহ সত্তর জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মহিলা সমন্বয় সংযোজিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। উল্লেখ্য, শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করছেন।

সমাবেশ সমাচার

চাঁচলে পরিবার প্রবোধন সভা

৩০ আগস্ট মালদহের চাঁচল শহরে পালিত হলো রাখি-উৎসব। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন রানী দাক্ষায়নী বালিকা উচ্চতর বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রীমতী রীতা দাস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী খেয়ালী চক্রবর্তী। উভয় অতিথিবৃন্দ রাখির গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের কুটুম্ব প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। তিনি তাঁর ভাষণে মায়েদের জীবন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত ও এই সঙ্কটময় সময়ে মায়েদের দেশের প্রতি কতখানি কর্তব্য তার বিস্তারিত আলোচনা করেন। শহরে বিশিষ্ট পরিবার থেকে পঞ্চাশ জন উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী চন্দনা চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যার্থী পরিষদের চিকিৎসক সম্মেলন

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে গত ৩০ আগস্ট কলকাতা রোটারি সদনে রাজ্য চিকিৎসক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, এবিভিপি-র পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, রাজ্য সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মন, রাজ্য সম্পাদক সুবীর হালদার ও রাজ্য সভাপতি রমন ত্রিবেদী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মেডিক্যাল কনভেনর ইন্দ্রনীল খাঁ ও গৌরাঙ্গ সাহা। রাজ্যের প্রায় ৩০০ জন চিকিৎসক এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

দুর্গাপুর সেবা বিভাগের ঋষি অরবিন্দ জন্মদিবস উদযাপন

দুর্গাপুর নগর সেবা বিভাগের উদ্যোগে নগর ও নগরসংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে যে সমস্ত সেবা প্রকল্প চলে সেই সমস্ত স্থানে গত ১৫ আগস্ট

ক্রীড়া ভারতীর জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন

গত ২৯ আগস্ট ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে মহাসমারোহে রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া দিবস পালিত হলো। বিকালে কলকাতার মানিকতলায় নরেশ ভবনে ক্রীড়া ভারতীর প্রাদেশিক সভাপতি তপন মোহন চক্রবর্তী, প্রাদেশিক সংযোজক তপন গাঙ্গুলি, যোগ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র আঞ্চলিক অধিকর্তা ড. অসিত আইচ এবং কলকাতার সম্পাদক বিভাস মজুমদারের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া দিবস এবং মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন পালিত হয়। মেজর ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে তিনবার ভারত হকিতে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং ভারতের সেবা করার জন্য জার্মানির সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ পদ ত্যাগ করেন। ড. অসিত আইচ-এর বক্তব্যে এই অবক্ষয়গুলি উঠে আসে। তপনবাবু ও বিভাসবাবুর বক্তব্যে মেজর ধ্যানচাঁদের জাতীয় ভাবনার দিকগুলি

আলোচিত হয়। সবশেষে কলকাতার পাঁচটি ভাগ থেকে পাঁচটি দল নিয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়। এই দলগুলি বিভিন্ন বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নামে নামকরণ করা হয়। মেজর ধ্যানচাঁদ নামের দলটি প্রথমস্থান অধিকার করে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুপ্রিয় ঘোষ।

ঊনসত্তরতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এবং ঋষি অরবিন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে অখণ্ডভারত দিবস উদযাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং শারীরিক প্রদর্শনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হয়। আমলৌকা ও হেতডোবা গ্রামে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের মাধ্যমে এবং নীলডাঙ্গা বস্তিতে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার উপস্থিত থেকে পতাকা উত্তোলন ও ভাষণ দেন। বাঙ্গুরী গ্রামে স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঋষি অরবিন্দের জীবন চর্চা করেন। মোট ৭টি স্থানে প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী এবং প্রায় ২৫০ জন অভিভাবক ও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে দিনটি উদযাপিত হয়।

মালদহের বগচড়ায় স্বাধীনতা দিবসে ভারতমাতা পূজা

ভারতের ৬৯তম স্বাধীনতা দিবস এবং বিপ্লবী ঋষি অরবিন্দ ঘোষের ১৪৪তম জন্মজয়ন্তী বগচড়া-কলিগ্রাম দুর্বাসা সঙ্ঘ কর্তৃক আয়োজিত পঞ্চম বর্ষের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এদিন ভারতমাতা পূজা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ভারতমাতা সাজো প্রতিযোগিতা, সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান— সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা, নাটক, এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ এবং স্বাধীনতা দিবস, অরবিন্দের বৈপ্লবিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-চেতনার উপর বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-নির্ভর ভাষণের মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য পরিবেশে মহাসমারোহে দিনটি পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কানুচন্দ্র দাস, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধুনা রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. গোপেশ চন্দ্র সরকার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী। অধ্যাপক ড. সরকার তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ঋষি অরবিন্দের বৈপ্লবিক চেতনা বিষয়ে ভাবগম্ভীর বক্তব্য রাখেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন দুর্বাসা সঙ্ঘের সহ-সভাপতি মৃগাঙ্ক দাস।

বিদ্যাভারতীর প্রধানাচার্য কর্মশালা

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গ এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ দক্ষিণবঙ্গের যৌথ উদ্যোগে গত ১৮ থেকে ২০ আগস্ট শিলিগুড়ির শতাব্দী সদনে সম্পন্ন হলো প্রধানাচার্য কর্মশালা। এই কর্মশালার দুই বঙ্গের মোট ৩৬ জন প্রধানাচার্য ও প্রধানাচার্যা উপস্থিত ছিলেন। এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দুই বঙ্গের পূর্ণকালীন কার্যকর্তাগণ। বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় সংস্কৃত শিক্ষা সংস্থানের সহ-সম্পাদক বিজয় গণেশ কুলকার্ণী পুরো সময় উপস্থিত থেকে প্রধানাচার্যের কার্যক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নের সমাধান যেমন দিয়েছেন তেমনি আগামী দিনে বিদ্যালয়ের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণাও যুগিয়েছেন। তিন দিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত থেকে যে সমস্ত কার্যকর্তা পথনির্দেশ করেছেন তাঁরা হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের কার্যকারিণীর সদস্য সত্যনারায়ণ মজুমদার, বিদ্যা ভারতী পূর্বক্ষেত্রের সহ-সভাপতি সত্যপদ পাল, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের দক্ষিণবঙ্গের সভাপতি গোপাল হালদার, বিদ্যাভারতীর পূর্বক্ষেত্র সহ-সংগঠন সম্পাদক গোবিন্দ ঘোষ, বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক পার্থ ঘোষ প্রমুখ। বিদ্যাভারতীর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান বিদ্যাভারতী পূর্বক্ষেত্রের সভাপতি সাধন মজুমদার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দক্ষিণবঙ্গের শৈক্ষিক প্রমুখ পীযূষ বসু, দক্ষিণবঙ্গের বৈদ্ধিক গণিত প্রমুখ বীরেন দে ও উত্তরবঙ্গের সহ-প্রশিক্ষণ প্রমুখ কেশবানন্দ পাল।

ঐতিহ্য ও সমসাময়িকতার মেলবন্ধন

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা : ১৪২২

পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত — নৈরাজ্য (রহস্য উপন্যাস)

সুমিত্রা ঘোষ — তোরা কোন গগনের তারা? (সামাজিক উপন্যাস)

প্রবন্ধ

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. প্রসিত রায়চৌধুরী, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়, নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য, অমলেশ মিশ্র, দেবব্রত ঘোষ, রমেশ পতঙ্গে, নবকুমার ভট্টাচার্য, বরুণ দাস, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত রায়।

বড় গল্প

গোপালকৃষ্ণ রায়

গল্প

রমানাথ রায়, শেখর বসু, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, এষা দে, গোপাল চক্রবর্তী, গার্গী দেব, সিদ্ধার্থ সিংহ।

বিচিত্র রচনা

পিনাকপাণি ঘোষ — চিঠি মিঠি, অর্ণব নাগ — সেকালের মেসবাড়ি, তাপস অধিকারী — পশুপাখির মাতৃস্নেহ।

চরিতকথা

জহর মুখোপাধ্যায় — কলকাতায় প্রথম নিবেদিতা

পুরাণকথা

বিজয় আঢ্য — এক রূপান্তরিত পুরুষের কথা

ভ্রমণ

সুভাষ বিশ্বাস— রথ উৎসবে হাম্পি

খেলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়— বিষ্ণুপুরের দশাবতরী তাস

সত্বর কপি বুক করুন।। মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
7 September - 2015 - Rs. 10.00

ओएनजीसी
ONGC

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

OPENING NEW PARADIGMS
EXPLORING DEEPER PLAYS

Induction of FPSO units to boost deep-water operations

A state-of-the-art rig mounted platform
RS-12 for expeditious production

Crude oil production of 22.264 MMT- at **7 year high**

Reserve Replacement Ratio **(RRR)** of 1.38 amongst the **best in the world**

22 new discoveries during **FY 14-15** against 14 in FY 13-14

Only Indian Energy Company in **'FORTUNE** - World's Most Admired Companies - 2014' list

Ranked No.3 Globally by **Platts** amongst E&P Companies

Ranked No.18 globally among Oil & Gas operations by **Forbes** Global 2000 list-2015

COURAGE TO EXPLORE | KNOWLEDGE TO EXCEED | TECHNOLOGY TO EXCEL

Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC)
CIN No. L74899DL1993GOI054155
Regd. Office: Jeevan Bharti, Tower-II, 124-Indira Chowk, New Delhi – 110001
Tel: +91 11 23310156 Fax: +91 11 23316413 Web: www.ongcindia.com | /ONGCLimited | @ONGC_

ONGC Group of Companies

Subsidiaries: ONGC VIDESH, MRPL, OMPL
Joint Ventures: OPaL, TPC (ONGC-Tripura Power Company Ltd.), tbl (ONGC TERI Biotech Limited), Petronet MHB Limited, MSEZ, DSL, Petronet LNG Limited
Associates: Pawan Hans Limited (A Government of India Enterprise)